১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ ১৪২৭

পাহাড়ের ওপর থেকে সবুজে ঘেরা বগা লেকের দৃশ্য - আলোকচিত্রী এ. এস. এম. জিয়াউল হক

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ ১৪২৭

দীর্ঘদিন ঘরে বন্দী থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে?

করোনার দিনগুলিতে ভ্রমণ – একেবারেই অসম্ভব কি?

বিশ্বজোড়া এই মহামারীর প্রকোপে যেসব শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ট্যুরিজম। বহু মানুষের রুটি-রুজি জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। হিরেন ছেত্রী, অর্জুন ছেত্রী, প্রসন্ন রাই-এর মতো পাহাড়ি গ্রামের মানুষগুলো আজ সবকিছু হারিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হোটেলে বা হোম স্টেতে কাজ করতেন এঁরা। যাঁরা হোটেল লিজ নিয়ে চালাতেন, তাঁরাও আজ চরম ক্ষতিগ্রস্ত। অনেক ট্যুর অপারেটর ব্যবসা ছেড়ে অন্য পেশা খুঁজছেন।

অতিপ্রাসঙ্গিক এই সমস্যাটি নিয়ে কথা হচ্ছিল নেচার ক্যাম্প রিট্রিটের সঙ্গে যুক্ত শৈবাল পাঠকের সঙ্গে। শৈবালের বক্তব্য, বেড়াতে গেলেই করোনা হয়ে যাবে সেকথা ঠিক নয়, সে তো বাড়ি বসেও কত মানুষই আক্রান্ত হচ্ছেন। উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি এবং অন্যান্য সতর্কতা পালন করলে নিশ্চিন্তে বেড়িয়ে আসা সম্ভব। আপাতত তো মানুষ নিজস্ব গাড়িতে যাবেন। সেইসব হোটেল বা গেস্টহাউসেই উঠবেন যেখানে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত সব ব্যবস্থা আছে। লকডাউন কাটতে উৎসাহী কেউ কেউ বেরিয়েও পড়ছেন। পৃথিবীর নানাদেশে আবার পর্যটকের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে সাগরপাড়ে বা পাহাড়ের বাঁকে। ভারতে এখনো করোনার দাপট জবুথবু অবস্থা চললেও এ রাজ্যে কিছু কিছু ট্যুরিস্ট স্পটে সরকারি গেস্টহাউস আবার খুলে গেছে। আপাতত অন্যতম গন্তব্য সবুজে মোড়া ডুয়ার্স।

শৈবালেরা সহায়তা চান না, বরং ঘুরে দাঁড়াতে চান এই অসময়ে।

তবে সাবধান থাকতে হবে সবসময়ই। আর মনে রাখা ভালো, দশ বছরের নিচের শিশুদের এবং ষাটোর্দ্ধদের না বেরোনোই ভালো।

নিরাপদে কাটুক দিনগুলি। ঘরে- বাইরে সুস্থ থাকুন সকলে।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় –

"কালকের রাস্তার শুষ্ক নীরস ভাব আজ কোথায় চ'লে গেছে। আবার রাস্তার পাশে পাশে চাষ আবাদ দেখা যেতে লাগল। পথের পাশে মধ্যযুগের ব্যারনদের ক্যাসলের মতন দু'টি প্রকাণ্ড দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল।"

- শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে "সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত"র পঞ্চম পর্ব

"একটু এগিয়েই রাস্তা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকল। হুট করে যেন অন্ধকার জ্বেলে দিল কেউ। সঙ্গে এক অদ্ভুত ঝিমধরা নিস্তব্ধতা। মনে হল কোন মহাজাগতিক পোর্টাল পেরিয়ে অন্য কোন ডাইমেনশনে পৌঁছে গেছি। ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের 'লিসনারস' এর সেই ট্রাভেলারটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।"

অভিষেক ব্যানার্জির 'কেদার ভ্রমণের বুকলেট'- এর অন্তিম পর্ব

~ আরশিনগর ~

বান্দরবানের পাহাড়ে বর্ষা অভিযান
- এ.এস.এম. জিয়াউল হক

শীতে গড়পঞ্চকোট - সঞ্চিতা হোড়

আমাদের ছুটি – ৩৪শ সংখ্যা

~ সব পেয়েছির দেশ ~

দুচাকায় গুরুদোংমার - গৌতম দে

বারাণসী ও এলাহাবাদ - তপন পাল

মহাবালেশ্বর ও টাপোলা - সমীরন সেন চৌধুরী

~ ভুবনডাঙা ~

গিয়ংজু : সিল্লা রাজত্বের অন্দরে – সম্পত ঘোষ

স্পেনে - মাদ্রিদ ও টোলিডোয় - সিদ্ধার্থ চৌধুরী

~ শেষ পাতা ~

পানিবিটায় এক ঝড়ের রাত - মৈনাক সেনগুপ্ত

শেষ বিকেলে হেনরি'জ আইল্যান্ডে - অরিন্দম পাত্র

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - 2020 AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দীপ্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের নির্বাচিত কিছু অংশ তাই পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য।

['সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত' -এই ভ্রমণকাহিনিটি ধারাবাহিকভাবে বেরোত প্রবাসী পত্রিকায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। লেখক শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিচিত কোনও নাম নয়। আজকের ইন্টারনেট-গুগুল ম্যাপ-ইন্সটাগ্রাম-ফেসবুক লাইভ যুগের তরুণ-তরুণীদের জন্য এখানে রইল প্রায় একশো বছর আগের কয়েকজন অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বাঙালি তরুণের ভ্রমণকথা।]

সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

পাঞ্জাব

১৩ই অক্টোবর, মঙ্গলবার - পানিপথ সহর থেকে ইতিহাস-বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র কয়েক মাইল দূরে। এইখানে তিন তিনবার মোগল-পাঠানের ভাগ্য পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। প্রথম ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীর সকল আশা চূর্ণ ক'রে মোগলেরা তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বারে আবার পাঠানের শেষ চেষ্টা - আকবরের কাছে হিমুর পরাজয়। আর শেষবার হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয় - মারহাট্টাদের পরাজয়, আহমদ শাহ্ দুরানির হাতে। এই ঐতিহাসিক পথ কতবার কত অভিযানের কোলাহলে মুখরিত হয়েছে! অশ্বের হ্রেষারবে, সৈন্য-সামন্তের অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে এখানকার বাতাস যেন আজও ভরপুর।

কালকের রাস্তার শুষ্ক নীরস ভাব আজ কোথায় চ'লে গেছে। আবার রাস্তার পাশে পাশে চাষ আবাদ দেখা যেতে লাগল। পথের পাশে মধ্যযুগের ব্যারনদের ক্যাসলের মতন দু'টি প্রকাণ্ড দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। মাইল কুড়ি পর আমরা কর্ণালের মধ্যে দুপুরের জলযোগের জন্য নেমে পড়লাম। পানিপথের মতন কর্ণালও প্রকাণ্ড প্রাচীর ঘেরা। সহরের ফটক আটটি। ষ্টেশন, আদালত এ-সব সহরের বাইরের ট্রাঙ্ক রোডের উপর। বাজার-হাট দোকান-পত্র সব সহরের মধ্যে। চওড়া রাস্তা খুবই কম, তিন চার তলা বাড়ীর মাঝ দিয়ে সরু সরু পাথরবাঁধান পথে লোকজন ও গাড়ী ঘোড়ার ভিড় কলকাতার মাড়োয়াড়ী-টোলারই মতন। বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে সহরকে বাঁচাবার জন্যে আগে এই রকম প্রাচীর দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আজকাল সে হিসাবে এর বিশেষ কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও এই রকম প্রাচীর ঘেরা পুরান ধরণের সহরগুলি মনে বেশ একটা শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের ভাব এনে দেয়।

কর্ণাল থেকে খুব শীঘ্রই বেরিয়ে পড়লাম। আজ আম্বালা আমাদের গন্তব্য স্থান। মাইল কুড়ি পর ট্রাঙ্ক রোডের বাঁ দিকে থানেশ্বর যাওয়ার পথ, দূরত্ব মাত্র ৯৷৷০ মাইল। আর ডান দিকের পথ দিয়ে বরাবর সাহরাণপুর চলে গেছে। রাস্তায় শাহবাদ গ্রাম পড়ল। গ্রামের কয়েকটি আটার কলের শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যায়।
ভেবেছিলাম পাঞ্জাবে গরম কমবে, হয়ত ঠাণ্ডা পড়ে, দুপুরে সাইকেলে ভ্রমণ করার কষ্টটা অনেক কমবে। কিন্তু এখানকার গরম ও রোদের তেজ যুক্তপ্রদেশের চেয়ে কিছু কম তো নয়ই বরং যেন বেশী ব'লে মনে হচ্ছে। তবে রাস্তায় প্রায়ই 'পিয়াউ' (জলসত্র) আছে ব'লে জলকষ্টটা অনেকটা কম।
বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছলাম। এখানে শ্রীযুত অবনী ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে উঠে পড়া গেল। পথে এলবিয়ান (Albion) গাড়ীর স্পিণ্ডল (Spindle) এর দোষের জন্য মাঝে মাঝে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছিল। সেটিকে মেরামত না ক'রে কাল রওনা হওয়া চলবে না। সুতরাং রোজকার মতন ভোর বেলায় ওঠবার দরকার হবে না ব'লে আজ নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমবার আয়োজন করলাম। আজ ৭০ মাইল আসা গেছে, কল্কাতা থেকে দূরত্ব মোট ১০৭৮ মাইল।

১৪ই অক্টোবর, বুধবার - গাড়ী মেরামত ও পরিষ্কার করতে বেলা দশটা বাজল। দুপুরে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। পণ্ডিত সুখন চাঁদ বেশ ভদ্রলোক। এঁরা অনেক পুরুষ আগে বাঙালী ছিলেন। পাঁচ ছয় পুরুষ এ দেশে থেকে একেবারে পাঞ্জাবী হ'য়ে গেছেন। তিনি যে মনে-প্রাণে বাঙালী বারবার এই কথা ব'লে গর্ব্ব অনুভব করলেন। পাঞ্জাবী প্রথায় খাওয়া হ'ল। ভাত আর রুটী একসঙ্গেই খাওয়া চলে। এখানে বাংলা মুল্লুকের মতন সকিড়র বিচারও নেই। এঁরা ব্রাহ্মণ; বাঙালীদের মতন মাছ মাংস খান না; তবে তার অভাবটুকু ঘিয়ের দ্বারা যথাসম্ভব পুষিয়ে নেন।
সকলের অনুরোধে আজ এখান থেকে চ'লে যাওয়ার আশা ত্যাগ করতে হ'ল। আম্বালা সহর এখান থেকে সাত মাইল দূর। বিকাল বেলা অগত্যা সেইদিকে যাওয়া হ'ল। ক্যান্টনমেন্টে প্লেগ হচ্ছে। সেইজন্য ক্যান্টনমেন্টের সব জায়গায় যাওয়ার হুকুম নেই।

১৫ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার - ক্যান্টনমেন্ট থেকে মাইল চার পরে ডানদিকে সিমলা যাবার রাস্তা। আঠার মাইল পর পাতিয়ালা ষ্টেটে যাবার পথ সান্নে পড়ে। এখানে ট্রাঙ্করোড রাজপুরার ভিতর দিয়ে লুধিয়ানার দিকে চ'লে গেছে।
আজ পথে একটু নূতন জিনিস দেখা গেল। এখানে চাষের জন্য ক্ষেতে বেশ একটি অভিনব উপায়ে জল সরবরাহ করা হ'য়ে থাকে। যুক্তপ্রদেশে বলদের

সাহায্যে কূয়া থেকে জল তুলে চাষীরা কাজে লাগায়। আর পাঞ্জাবে কূয়ার ওপর ছোট ছোট বাল্তি বা কলসী দিয়ে লম্বা চেনের মতন তৈরী করে এক প্রকাণ্ড চাকার ওপর বসিয়ে সেই বাল্তি-চেক্কে দুটি বলদের সাহায্যে ঘুরিয়ে জল তোলে। এই সমস্ত ব্যাপারটাকে দূর থেকে অনেকটা ঘানির মতন দেখায়। কূয়ার মুখ থেকে ক্ষেতে জল যাবার রাস্তা করা থাকে। এই উপায়ে এখানকার চাষীরা বিনা পরিশ্রমে চাষের জন্য প্রচুর জল ক্ষেতে সরবরাহ করতে পারে। কোন হাঙ্গাম নেই, বলদ দুটিকে চালাতে পারলেই হ'ল। রাত্রে এরা ঘানির ওপর ব'সে ঘুমায় আর বলদ দুটি আপনি আপনি ঘুরতে থাকে। চাষের মরশুমের সময় এই উপায়ে পাঞ্জাবী চাষা চব্বিশ ঘন্টাই জল তুলে কাজে লাগায়। এই জিনিসটিকে 'খু' বলে। সৈয়দপুর গ্রামে ঠিক দুপুর রোদে একজন লোকের কাছে জল চাইতে সে এই রকম 'খু'য়ের দিকে দেখিয়ে বলেছিল, ওখানে গিয়ে যত পার জল খাও; অফুরন্ত জল চারজন কেন চারশ'জনেও শেষ করতে পারবে না। বাস্তবিক এই সব কূয়ার জল যেমনি প্রচুর তেমনি ঠাণ্ডা।

আম্বালা থেকে ৪১ মাইল পর গোবিন্দগড় সহর। সহরের মন্দিরগুলির চূড়া সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। এই সহরের সাম্নে থেকে নাভা ষ্টেটে যাবার রাস্তা সোজা চ'লে গেছে। লুধিয়ানা সহরের কয়েক মাইল দূর থেকে রাস্তার পাশের শিশু-গাছের সারি বরাবর সহরের সীমানা অবধি চ'লে এসেছে। এই রাস্তা দিয়ে বেলা প্রায় চারটের সময় লুধিয়ানা সহরে পৌঁছলাম। রাস্তার বাঁ দিকে লুধিয়ানা ক্যান্টনমেন্ট্। সেও এক প্রকাণ্ড সহর। এখানকার সব বড় সহরেরই একটা ক'রে ক্যান্টনমেন্ট্ আছে।
ইব্রাহিম লোদী এই সহরের পত্তন করেন। তাঁর নামের অনুকরণে এই লুধিয়ানা নাম হয়েছে। লুধিয়ানা শাল-আলোয়ানের জন্য বিখ্যাত। শহরে শাল আলোয়ানের কারখানা বিস্তর। এই রকম এক কারখানা দেখে সন্ধ্যার সময় শ্রীযুত রাঘবেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে রাত্রের মতন আশ্রয় নেওয়া গেল। আজ ৭৪ মাইল আশা হয়েছে। মিটারে সব শুদ্ধ ১১৭৭।

১৬ই অক্টোবর, শুক্রবার - ইব্রাহিম লোদীর কেল্লার সামনে দিয়ে আবার ট্রাঙ্করোডে এসে পড়া গেল। লুধিয়ানা বেশ বড় সহর। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কমার্সিয়াল কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি সবই আছে। বেলা ৯টার সময় বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক ৯ মাইল পর শতদ্রুর সামনে এসে পড়লাম। নদীর ওপর পাশাপাশি দুটি পুল। একটি রেলের ও অন্যটি গাড়ী ও লোকজনের জন্যে। শতদ্রুর অপর পারের ফিলৌর সহর। এই সহরের বুকের ওপর দিয়ে ট্রাঙ্করোড জলন্ধর অভিমুখে চ'লে গেছে। নদীর ওপর থেকে প্রথমেই চোখে পড়ে, পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের প্রকাণ্ড দুর্গ। এই দুর্গ এখন পাঞ্জাবের পুলিস ট্রেনিং স্কুলে পরিণত হয়েছে।
পুলিস লাইনের সামনে দিয়ে যেতে যেতে নজর পড়ল একটি বাঙালী নাম লেখা বোর্ডের দিকে। ভিতর থেকে খোকাখুকীদের খেলা-ধূলা ও হাসির শব্দ কানে এল। এদের সঙ্গে আলাপ না ক'রে চ'লে যেতে ইচ্ছা হ'ল না। ইতস্ততঃ না করে নেমে পড়লাম। বাড়ীর সামনে যেতেই গৃহস্বামী বেরিয়ে এলেন।
ভদ্রলোকের নাম শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ঘোষ। ইনি বহুদিন পাঞ্জাব-প্রবাসী। ছোট ছেলেমেয়েদের পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলা দেখে প্রথমে সত্যসত্যই আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিলাম। এদের আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। মহিলারা পর্য্যন্ত বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন এখানে অন্ততঃ আজকের দিনটা থেকে যাবার জন্যে; পুরা একদিন বিশ্রামের পর মাত্র ৯ মাইল এসে আড্ডা ফেলা যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল না। কাজেকাজেই এখানে বেশ মোটাগোছের জলযোগের পর, ফিরতি বেলায় এখানে এসে দু'দিন থেকে যেতে হবে এই প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়ে তবে এঁরা আমাদের ছেড়ে দিলেন। বিদেশের বাঙালী, বাঙালীর জন্যে কি করে তার পরিচয় সারা পথেই পেয়েছি। ফিলৌরের আশে পাশে খুব তরমুজের চাষ হয়। পথের পাশে কয়েক মাইল ধ'রে কেবল তরমুজের ক্ষেত। ২০ মাইল পর রাস্তাটি দু'দিকে বিভক্ত হ'য়ে গেছে - বাঁ দিকেরটি জলন্ধর ক্যান্টনমেন্টে ও ডান দিকেরটি জলন্ধর সহরে। আমরা ক্যান্টনমেন্ট্ হ'য়ে সহরে ফিরে এলাম। ক্যান্টনমেন্ট্ ও সহরের মাঝখানে ট্রাঙ্ক রোডের উপর সামরিক বিদ্যালয় (King George Royal Military School) । পাঞ্জাবের অন্যান্য সহরেও এই রকম সামরিক বিদ্যালয় দেখা যায়। পাঞ্জাব 'সিপাহী'র দেশ, এখানকার প্রত্যেক সহরেই একটা ক'রে ছাউনি আছে। সহরের পথে-ঘাটে উর্দ্দি পরা সৈনিক, ছাউনির মাঠে সৈনিকদের কুচকাওয়াজ ও প্রহরে প্রহরে বিউগ্লের আওয়াজ এমন একটা জিনিস, যা বাঙালীর কাছে একেবারে নূতন।
জলন্ধরে নূতন পাওয়ার হাউস (বিদ্যুৎ-সরবরাহের কারখানা) তৈরী হয়েছে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আনন্দর এসব বিষয়ে আগ্রহ খুব বেশী। কাজে কাজেই সহরের অপর প্রান্তে পাওয়ার হাউস্ দেখ্তে চল্লাম। দৈবক্রমে এখানে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেল। এখান থেকে ফিরে পরেশ-বাবুর আস্তানায় সেদিনের মতন আড্ডা ফেলা হ'ল।

জলন্ধর সহর হোটেলে পরিপূর্ণ। এইসব হোটেলের মধ্যে কতকগুলি শিখ্দের আর কতকগুলি মুসলমানদের। শিখদের হোটেলে কেবল পিতলের বাসন ব্যবহার করা হয় আর মুসলমানেরা কলাই-করা বাসন ব্যবহার করে। হোটেলের সুমুখে এই রকম পিতল বা কলাই-করা ডেক্চি সাজান থাকে। এই ডেক্চির সাহায্যে বিদেশীকে, হিন্দু বা মুসলমানের হোটেল বুঝে নিতে হয়। এই রকম এক হোটেলে রাত্রে খাবার বন্দোবস্ত করা হ'ল। হোটেলে রুটী আর মাংস সব সময়েই পাওয়া যায়। ভাত খেতে হ'লে আগে খবর দিয়ে রাখ্তে হয়। পাঞ্জাবীরা এত বড় থালা ব্যবহার করে যে, আমাদের কাছে তা নেহাৎ অপ্রয়োজনীয় ব'লে বোধ হয়। প্রকাণ্ড পিতলের থালার ওপর সাত আটটি ছোট ছোট বাটী। থালা থেকে বাটীগুলি আর নামিয়ে রাখার দরকার হয় না। তরকারীর মধ্যে 'টিণ্ডা'(ধূল জাতীয়) পাঞ্জাবীদের অতি মুখরোচক সামগ্রী! আশে পাশের টেবিল থেকে ঘন ঘন "এ মুণ্ডে (ছোকরা বা 'বয়') টিণ্ডা ল্যাও" শুনেই তা বুঝতে পারা গেল। আজ মোট ৪৩ মাইল বাইক করা গেছে। মিটারে উঠেছে ১২২০।

১৭ অক্টোবর, শনিবার - সকাল সকাল রওনা হ'লাম। মাইল নয় আসার পর হঠাৎ বৃষ্টি সুরু হ'তে পথের ধারে এক গ্রামে আশ্রয় নিতে হ'ল। বৃষ্টি শীঘ্রই থেমে গেল, কিন্তু রওনা হ'তে না হ'তেই ২নং ষ্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ীর ফ্রি হুইলের স্প্রিং কেটে গেল। সেটাকে মেরামত করতেও খানিকটা সময় কাটল। এখানকার লোকজনের পোষাক ও চেহারা এইবার একবারে বদ্লে গেছে। আম্বালার পর থেকে এই পরিবর্ত্তনটা চোখে লাগে। পাঞ্জাবের রাস্তা সব চেয়ে ভাল। আজকের দিনটাও বেশ ঠাণ্ডা, সেইজন্য অনেক দিন পর বেশ আরামে পাড়ি দেওয়া যাচ্ছে। ঠিক ৩৪ মাইল পর ট্রাঙ্ক রোডের বাঁ দিকের পথ দিয়ে কর্পূরতলা ষ্টেট মাত্র ৭৷৷০ মাইল দূর।
আজ পথে পড়ল বিপাশা। বিপাশার ওপরেই তাকদাক স্যানাটোরিয়াম্। এইখান থেকে কয়েকজন পাঞ্জাবী যুবক আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইকেল চালাতে সুরু করলে। তারা যে সাইকেল ক'রে অমৃতসর যাচ্ছে এই খবরটা বার বার আমাদের শুনিয়ে দিলে। প্রাণপণ শক্তিতে সাইকেল চালিয়ে তারা এগিয়ে যেতে যেতে আমাদের দিকে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখতে লাগল। ভাবটা, যে হারিয়ে ত দিয়েছি আর কি? ক্রমশঃ তারা আমাদের পিছনে ফেলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। অন্যমনস্ক হ'য়ে চলেছি, অল্পক্ষণ পরেই এক ছায়া-ঢাকা 'পিয়াউ'র (জলসত্র) সুমুখে এসে দেখি বন্ধুরা সেইখানে ব'সে ঘটি ভর্ত্তি ক'রে জল পান করছেন। লট-বহর সমেত সাইকেলগুলি এখানে সেখানে প'ড়ে রয়েছে। আর রুমালের সাহায্যে দাড়ির ফাঁকের ঘামের স্রোত বন্ধ করার কি বিপুল প্রয়াস চলেছে।

আজ সাইকেলের জন্য রাস্তায় দুবার থাম্তে হ'ল। এমন কোনো দিন হয় না। ক্রমশঃ দলে দলে গরু-মহিষের পাল রাস্তায় দেখা যেতে লাগল। সকলেরই গন্তব্য অমৃতসর। প্রথমে খেয়াল করিনি, কিন্তু ক্রমশঃই পালের আধিক্য দেখে খোঁজ নিয়ে জান্লাম অমৃতসরের প্রসিদ্ধ বাৎসরিক মেলায় এদের নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে প্রতিবৎসর দেওয়ালীর আগে ও পরের কয়েকদিন ধ'রে এই রকম ছাগল, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি বিক্রী হয়।
মেঘ মেঘ করছিল, হঠাৎ এমন ঝড় উঠল যে, ধূলায় চারদিক অন্ধকার হ'য়ে গেল। পথের দু'পাশে বড় বড় গাছের সারি। ঝড়ে সেইসব গাছের ডাল মট্ মট্ ক'রে ভাঙতে সুরু হ'ল। লোকজন গরু-মহিষ সব রাস্তা ছেড়ে ফাঁকা মাঠে পালাতে লাগল। সেখানে ধূলায় অন্ধকার। নাক-মুখ ধূলায় একেবারে বন্ধ। সকলে চোখ মুখ ঢেকে চুপচাপ ব'সে পড়ল। আমরাও অগত্যা সেই উপায় অবলম্বন কর্লাম। মাথার ওপর দিয়ে প্রলয়ের ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে। তার গর্জ্জনে গাছের ডাল-পালা নুয়ে পথের ওপর এসে পড়ছে। সকলে চুপ, কথা বল্বার যো নেই। সেচেষ্টা কর্লেই এক ঝলক ধূলা-বালি মুখের ভেতর ঢুকে যাবে।
আধ ঘন্টা পরে ঝড় থেমে গেল। ঝড় যেমন হঠাৎ এসেছিল গেলও তেমন হঠাৎ। কেবল পথের পাশের সদ্য-ভাঙা ডাল ও গাছের পাতার ধূসর মূর্ত্তি ভিন্ন বোঝবার যো নেই যে, এইমাত্র এক প্রলয়ের কাণ্ড সুরু হয়েছিল। বৃষ্টির কোনো আভাস নেই। প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল। আবার রাস্তায় ফিরে এসে সাইকেল চালিয়ে দিলাম। অমৃতসরের দু'মাইল দূর থেকে মেলার জন্য এমন গরু-মহিষের ভিড় বাড়ল যে, সাইকেল থেকে নেমে হাঁটেত সুরু ক'রে দিলাম।

বিকালে অমৃতসরে পৌঁছলাম। মেলা ও দেওয়ালী উপলক্ষ্যে সহরে ভারী ধূম। শিখদের স্বর্ণমন্দিরের অনুকরণে হিন্দুরা এখানে এক মন্দির তৈরী করেছে তার নাম দুর্গিয়ানা। সহরের অপরাপর প্রসিদ্ধ জায়গাগুলি বিজলী-বাতি দিয়ে সাজাবার ব্যবস্থা হয়েছে; এখানকার বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস খুব ছোট।

দুর্গিয়ানা ও অন্যান্য মন্দিরগুলিতে আলোর বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য অনেক রাস্তা একেবারে অন্ধকার।
সন্ধ্যার সময় কাইজারিবাগে শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে উঠে পড়লাম। অমৃতসর থেকে আমরা গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে নূতন পথে শিয়ালকোট অভিমুখে যাবো। ম্যাপে সেই নূতন পথ সম্বন্ধে যে রকম খবর দেওয়া আছে শুধু তার ওপর নির্ভর ক'রে যাওয়া যাবে না। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে সঠিক খবর জানা দরকার। তাতে সময় চাই। সুতরাং কাল এখান থেকে রওনা হওয়া চলবে না। সেই খবর সংগ্রহ করার জন্যে যদিও অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে, কিন্তু ভোরে উঠেই যে কম্বল বাঁধাবাঁধির হাঙ্গাম নেই, বেলা ৭টা অবধি নিরুদ্বেগে শুয়ে থাকার আরামটুকু উপভোগ করা যাবে, এই ভেবে নিশ্চিন্ত মনে নিজের নিজের কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইক করেছি আজ ৫৫ মাইল। মিটারে উঠেছে মোট ১২৭৫ মাইল।

১৮ই অক্টোবর, রবিবার - অমৃতসর প্রকাণ্ড সহর আর মস্ত বড় ব্যবসায়ের কেন্দ্র। শাল-আলোয়ানের জন্যও অমৃতসরের নাম দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আর অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের নাম ভারতবর্ষে কে না শুনেছে?
শিখদের এই ধর্ম্মমন্দিরের ব্যবস্থা বড় চমৎকার। এখানে বারমাস যাত্রীদের ভিড় লেগে রয়েছে, কিন্তু আমাদের তীর্থস্থানগুলির মত অনাবশ্যক গোলমাল বা 'চীৎকারের'বাহুল্য নেই। প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যে মন্দির। মন্দিরের মাথাটি সোনালি পাতের মোড়া। কেবল সরোবরের ওপর দিয়ে মন্দিরের যাবার একটিমাত্র পথ। আর এই সরোবরের চারপাশে যাত্রীদের থাক্বার জন্যে অসংখ্য ছোট ছোট ঘর। মন্দিরে প্রবেশ করার আগে একটি বড় চৌবাচ্চায় সকলকে পা ধুয়ে যেতে হয়। আর-একটি বিশেষ নিয়ম যে, মাথায় কোনো রকম আবরণ না দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করা বারণ।
মন্দিরের মাঝখানের ঘরে 'গ্রন্থসাহেব' সংরক্ষিত আছেন। যাত্রীরা সকলে যথাক্রমে তিনবার গ্রন্থসাহেবকে প্রদক্ষিণ ক'রে বাতির শিখায় নিজের নিজের হাত ছুঁইয়ে বুকে ও মাথায় ঠেকায়। এরই একপাশে একদল বাদক গান-বাজনার দ্বারা দেবতার মনস্তুষ্টি করবার চেষ্টা করছে। 'গ্রন্থসাহেবের' সামনে প্রকাণ্ড পাঞ্জাবী-থালায় যাত্রীরা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী পয়সা, টাকা বা মোহর দিয়ে প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে আসে। এর পাশে আর-একটি ছোট মন্দির। সেটিতে শিখ সম্প্রদায়ের গুরুদের স্মৃতিচিহ্ন রেখে দেওয়া হয়েছে।
কাইজারিবাগের কাছেই জালিয়ান্ওয়ালাবাগ। এই জালিয়ান্ওয়ালাবাগেই সেদিন কত হতভাগ্যেরই না জীবনের অবসান হ'য়ে গেছে। আগে জালিয়ান্ওয়ালাবাগ চারপাশে বাড়ীঘেরা এক টুকরা ছোট জমি মাত্র ছিল। এখন কংগ্রেস থেকে সমস্ত জায়গাটি কিনে নেওয়া হয়েছে। স্থানে স্থানে রক্তের মত লাল রংয়ের ফুলগাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন সেই বিশেষ দিনটির কথা মনে পড়িয়ে দেবার জন্যে। এক পাশে একটি প্রকাণ্ড কুয়া - যার মধ্যে প্রাণভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে কয়েকশত লোক আত্মরক্ষার জন্য লাফিয়ে পড়ে সমাহিত হ'য়ে গিয়েছে। এখানকার স্মৃতি বড়ই করুণ। মন আপনা-আপনি বিষাদে পূর্ণ হ'য়ে উঠল।
অমৃতসরের বাজার থেকে আমরা প্রয়োজনীয় জিনিষ কিছু কিছু কিনে নিলাম। শিয়ালকোট যাবার পথ খানিকটা মন্দ নয়; সেখবরটা সহজেই পাওয়া গেল। কিন্তু বাকী খানিকটা পথের খোঁজ কেউ ঠিক দিতে পার্লে না। আমরা জম্মু হয়ে শ্রীনগর যাব এই ঠিক করেছিলাম। জম্মু যেতে হ'লে শিয়ালকোট যেতে হবেই; সুতরাং নিজেদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে এই অপেক্ষাকৃত 'শর্ট-কাট্' রাস্তা দিয়ে শিয়ালকোট রওনা হওয়া যাবে এই স্থির ক'রে ফেল্লাম। লাহোরের পর ওয়াজিরিবাদ থেকে অবশ্য শিয়ালকোটে যাবার খুব ভাল রাস্তা আছে। কিন্তু লাহোর ও ওয়াজিরিবাদ ফির্তি পথে পড়বে, সেইজন্য এই 'শর্ট কাট' রাস্তাই আমরা সুবিধাজনক মনে কর্লাম; যদিও ম্যাপে এই রাস্তার খানিকটা এমনভাবে দেখান হয়েচে, যাতে রাস্তার অবস্থা মোটেই ভাল নয় ব'লে বোধ হয়। বিকালে এই নূতন পথে ন'মাইল এগিয়ে নমুনা দেখে আসা হ'ল। মিটারে আজ উঠল ২৬ মাইল।

১৯শে অক্টোবর, সোমবার - খুব ভোরে উঠে রওনা হ'য়ে পড়লাম। ১৫ মাইল পর আজনালা খুব ছোট জায়গা। অমৃতসর থেকে এই অবধি মোটর লরী ও টোঙ্গা যাতায়াত করে। আজনালা পৌঁছাতে প্রায় দেড় ঘন্টা লাগল। আজনালার পর থেকে যে রাস্তা সুরু হ'ল তাকে রাস্তা না ব'লে নদীর চড়া বা বালির মাঠ বল্লেই ভাল হয়। কয়েক মিনিটের পরই আমরা প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে এসে পড়লাম। রাস্তা ব'লে একে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু দু'একজন লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল এইটাই শিয়ালকোটের পথ। অগত্যা আর ইতস্ততঃ না ক'রে মাঠে নেমে পড়লাম।
অল্পক্ষণ পরেই এমন নরম বালির উপর এসে পড়লাম যে সাইকেল আর চলে না। আরও কিছুক্ষণ পরে চ'লে চ'লে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যাওয়াও কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়াল। বালির ওপর দিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়াই কি রকম কষ্টকর তার উপর আবার এই লটবহর শুদ্ধ সাইকেল ঠেলে নিয়ে যাওয়া! মাথার ওপর দুপুরের চন্চনে রোদ। দুপুর বেলা ইরাবতী নদীর ধারে এসে পড়লাম। সুবিধার কথা যে নদীর পারের জন্য নৌকার বন্দোবস্ত আছে। রাস্তার এই অবস্থা, পারের এমন সুবিধা, সৌভাগ্যের কথা বল্তে হবে! নদীর ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে সুস্থির হলাম। ইরাবতী এখানে পঞ্চাশ ষাট গজের বেশী চওড়া হবে না, তবে খুব গভীর।
এপারে এসে বালির চড়া পার হ'য়ে রাস্তায় আসা গেল। রাস্তার দুপাশে বাবলা গাছ। রাস্তা অত্যন্ত জঘন্য। বাবলা কাঁটার জন্য অত্যন্ত সাবধানে গাড়ী চালাতে হচ্চে। মাইল খানেক যেতে না যেতে চাকায় এমন ফুটা (puncture) হ'তে সুরু হ'ল যে অগত্যা সাইকেল থেকে নেমে হেঁটে যেতে বাধ্য হ'লাম। কিন্তু পথ থাকতে কতক্ষণ হেঁটে যাওয়া যায়? সাইকেল চড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে পর পর চারখানি গাড়ীর চাকায় ফুটা হওয়ায় সাইকেলে যাওয়ার আশা ত্যাগ ক'রে হাঁটতে সুরু ক'রে দিলাম। হিসাব ক'রে দেখা গেল তিন মাইল রাস্তায় সাতবার ফুটা হওয়ার দরুণ আমাদের সাইকেল থেকে নাম্তে হয়েছে। সুতরাং এমন রাস্তায় সাইকেল চালান বা হেঁটে যাওয়ার কিছু তফাৎ নেই।
এইভাবে চ'লে বেলা দেড়টার সময় রেওয়া ব'লে একটা ছোট জায়গায় পৌঁছলাম। আজনালার পর এই প্রথম লোকালয় চোখে পড়ল। এর মধ্যে ছোটখাট একটা বসতিও নজরে পড়েনি। পথে কিছু মিলবে না ব'লে, আজ খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় ক'রে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। এক কূয়ার ধারে ব'সে পাঁউরুটী ও জমান দুধ খেয়ে পেট ভর্ত্তি করা হ'ল। রেওয়া থেকে একদিকে নাবওয়াল ও অপরদিকে লাহোর যাবার পথ দেখা গেল।
ঘন্টাখানেক পর বেরিয়ে পড়লাম। এখানে শোনা গেল পশরুর থেকে শিয়ালকোট যাবার পথ ভাল। এখান থেকে পশরুর অবধি পথের অবস্থা এইরকমই। এখনও কুড়ি মাইল এই রকমের রাস্তা পার হ'য়ে যেতে হবে শুনে চম্কে উঠলাম।
এই কুড়ি মাইল পথ যে এসেছিলাম তা এখন বিশ্বাস হয় না। কখন হেঁটে, কখনও বা সাইকেল ঘাড়ে ক'রে, নদী নালা বালির চড়া ভেঙ্গে, আর মাঝে-মাঝে সাইকেল চালাবার বৃথা চেষ্টা ক'রে পশরুরে যখন পৌঁছলাম তখন রাত আটটা। পশরুর মাঝারিগোছের একটি সহর ও রেল-ষ্টেশন। এখানে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী ব'লে মনে হ'ল। শিয়ালকোট পঁচিশ মাইল দূর। তবে রাস্তা ভাল ব'লে, এখানে নৈশভোজন শেষ ক'রে শিয়ালকোটের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলাম। অন্ধকার রাত, অজানাপথে মাঝে মাঝে কেবল 'খু' চলবার 'ক্যাঁচ ক্যাঁচ' শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই, চোর ডাকাতের পাল্লায় পড়লেই অস্থির।
ক্রমশঃ শিয়ালকোট-সহরতলীর আলো অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। আশা হ'ল আজকের মত পথের বুঝি শেষ হ'ল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর পথশ্রান্ত পথিকের কাছে সে আশা কত লোভনীয়, কত আরামপ্রদ। রাত বারটার সময় শিয়ালকোট রেল ষ্টেশনের কাছে নেমে পড়লাম। সহরে তখন সব বাড়ীর দরজা বন্ধ। ষ্টেশন-মাষ্টারের অনুমতি নিয়ে একখানা খালি গাড়ীর মধ্যে রাত কাটার ব্যবস্থা ক'রে ফেললাম। ধূলা-ভর্ত্তি পোষাক বদলাবারও আর ইচ্ছা হ'ল না, কোন রকমে শুয়ে পড়া গেল। আজ ৭৬ মাইল আসা গেছে - মিটারে উঠেছে ১৩৭৭।

ক্রমশঃ

- ক্রমশঃ -

(প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৩ সংখ্যা)

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমোরিয়াল আর্কাইভ

[মূলের বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - তৃতীয় পর্ব

কেদার ভ্রমণের বুকলেট

অভিষেক ব্যানার্জি

~ *কেদারের আরও ছবি* ~

পূর্বপ্রকাশিতের পর

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_১৩আনার_গয়না
#কুড়িয়ে_পাওয়া_ম্যাপল
#পিপলকোটির_খটাখটি

"জানে না কহাঁ ওহ দুনিয়া হ্যায়,
জানে না ওহ হ্যায় ভি ইয়া নহি,
জহাঁ মেরি জিন্দেগি মুঝসে,
ইতনি খফা নহি..."

তুঙ্গনাথ থেকে নেমে হিসেব মিলিয়ে জিনিস ফেরৎ দিতে পারায় আমরা মহা খুশি। ডিপোজিট মানি বাপিস নিয়ে ড্যাংড্যাং করতে করতে নেমে এলুম। গেটে ঘন্টা বাজিয়ে যাত্রাশেষ করে হাঁকুপাঁকু করে ছুটলাম খাবার দোকানে। পেটে খিদে চাগাড় দিচ্ছিল। ব্রেকফাস্টের দোকানে না গিয়ে অন্য আরেকটায় গিয়ে জমিয়ে ভাত-রুটি খাওয়া হল। এরপর প্ল্যান ঠিক ছিল না আমাদের। তুঙ্গনাথ যেতে যেতে ঠিক হয়েছিল আরেকটা কেদার কল্পেশ্বর করা হবে। দুটো অলরেডি করে ফেলেছি। একযাত্রায় তিনখানা হয়ে গেলে পায় কে। কিন্তু ইন্দ্রের একখানা হতচ্ছেদ্দা লাইন ড্রয়িংওলা ম্যাপ আমাদের ভরসা। তাতে দেখাচ্ছে জোশীমঠের রাস্তায় হেলাং হয়ে যেতে হবে। কিন্তু কতটা হাঁটতে হবে পেলাম না। নেটও ঝোলাচ্ছে, যাই হোক ঠিক যখন হয়েছে তখন দেখাই যাক না।
ভালোমন্দ খাইয়ে ভাণ্ডারীকে গাড়িতে তোলা হল। উঠেই সিটে বসে প্রশ্ন "অব কাঁহা?" ইন্দ্র সামনে বসেছিল। বলল চামোলি হয়ে আমরা হেলাং যেতে চাই। ব্যস! জ্বলে আগুন, তেলে বেগুন। টিকিধারী বিহারি এই মারে তো সেই মারে, একেবারে রেগে কাঁই। লালমোহনবাবু লিখলে লিখতেন -"ইয়ার্কি পায়া হে?" কিন্তু ভাণ্ডারীর হিন্দি ভালো, স্পষ্টভাষায় জানালো হবে না। পারব না। ২০০ কিমি এক্সট্রা ঘুরতে পারব না, আপনারা গাড়িমালিকের সাথে কথা বলুন। এরকম হুটহাট রুট পাল্টালে হবে না। কোথায় যাবার কথা ছিল রাঁশি সেখানে কল্পেশ্বর। ওসব আমি চিনি না, নিয়েও যেতে পারব না। গাড়ি ঠিক করার দায়িত্বে ছিলেন অধিনায়ক স্বয়ং। ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণুর কাছে আসা ব্যাকুল দেবতাদের মত আমরাও অসহায় মুখে অধিনায়কের দিকে তাকালাম। এদিকে আমরা ফোন করার আগেই ভাণ্ডারী ফোন লাগিয়ে ফেলেছে। যাইহোক গাড়ির মালিক বেওয়াফাই না করে রাজি হয়ে গেল, ভান্ডারীর কানে কী ফুসমন্তর দিল জানিনা, গজগজ করতে করতে সে গাড়ি ছেড়ে দিল। তবে গাড়ির স্পিড দেখে ঠেকুয়া যে বেশ শক্তপাকের হয়েছে বোঝাই যেতে লাগল হাড়ে হাড়ে।

জানলা খুললেই লাউডগা সাপের মত হিলহিলে ঠাণ্ডা হাওয়া ছোবল মারছে। এদিকে ইন্দ্রর ফোনের পর ফোন আসছে। ওর বাবা-মা আর ছাত্রদের একটা দল আসছে কলকাতা থেকে। ওরা আজ দুন-এ উঠবে। তারপর ইন্দ্রর সাথে মিট করবে জোশীমঠে। আমরা ব্যাক করব আর ওরা বদ্রীনাথ যাবে। যতবার 'জোশীমঠ, মানা, বদ্রীনাথ' এইসব শুনছে, ততবার কান খাড়া হচ্ছে আর টিকি দুলছে ভান্ডারীর। মনে মনে শিওর ভাবছে এরা আমায় বদ্রীনাথ টেনে নিয়ে যাওয়ার তাল করছে, শালা কী খচ্চর এই বাঙালিগুলো। গাড়ি এগোচ্ছে ভালোই। সগর পেরিয়ে চামোলির দিকে যেতে যেতে রাস্তায় চেরিগাছের মেলা বসেছে দেখলাম। অপূর্ব লাগছে, যেন একমুঠো গোলাপী আবির কেউ ছিটিয়ে দিয়েছে গাছগুলোর উপর। ঠিক হয়েছিল চামোলিতেই থাকব। চামোলির মেইন মার্কেটের রাস্তা যখন পেরিয়ে যাচ্ছে তখন জিজ্ঞেস করায় ভাণ্ডারী জানালো এই ব্যস্ত জায়গায় থাকার মত ভালো হোটেল নেই। এদিকে সবাই ক্লান্ত। কারো আর এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। কিন্তু ভান্ডারী কারো কথা শুনতে রাজি নয়। আশ্বাস দিয়ে বলল আমি একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি চলো, যদি পছন্দ না হয় বলবে আমি ফিরে আসব। এরপর আর কথা চলে না।

দিনের বেলা যেসব জিনিস দেখা যায়না, অন্ধকারের ওড়না জড়িয়ে তারাই হাজির হয় আলগোছে, পা টিপে টিপে। কখন একা আর ফাঁকা করে দিয়ে চলে যায় বোঝা যায় না। এতক্ষণ গাড়িতে এসে সবাই চুপ। ঘেঁটুফুলের গন্ধের মত পাহাড়ের গন্ধে মাতাল হয়ে সবাই বাইরের দিকে তাকিয়ে। একটা জায়গায় রাস্তা অনেক চওড়া। মাঝখানে একটা ন্যাড়া গাছ গা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একলা, হয়তো কারো বাড়ির উঠোনের প্রিয় গাছের কথা মনে পড়ায় তারা আর কাটেনি। অনেকক্ষণ কথা না বলায় অধরে জুড়ে গেছে ওষ্ঠ। মিউজিক সিস্টেমে কী গান বাজছে কারো খেয়াল নেই। ঘন নীল থেকে ছাই হতে হতে আকাশ যখন কালো, তখন যেন চটকা ভাঙল। কিলোমিটারের সাইন বলছে আমরা এসে গেছি পিপলকোটি। হেডলাইটের আলোর কাটাকুটি পেরিয়ে যখন কাটা আর গোল্লা দিয়ে সব ঘর ভর্তি, তখন শুধু জিতে গেল হিমালয়। আমরাও শ্বাস ফেললাম হোটেল দেখে। ১২০০ টাকার বিশাল ডরমিটরি ১০০০-এ হয়ে গেল ইন্দ্রর কথার গুণে। আমরাও খুশ, ভান্ডারীও।

সবাই অনেকদিন পর গরম জলে শ্যাম্পু দিয়ে ভালো করে স্নান সারলাম। তারপরেই হাঘরের মত সাতজন্মের খিদে তেড়ে এল। নিচেই হোটেলের রেস্টুরেন্ট। সুখাদ্যের ঘ্রাণ টম আর জেরির মত নাকের সামনে গন্ধ-আঙ্গুল দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল। থালি নিল কিছুজন আর আমরা কজন রুটি আলুর দম, ভিন্ডিভাজা। সামনের টেবিলে খাবার আসছে আর আমরা সামনে থেকে দুধের বাটি কেড়ে নেওয়া দামড়া হুলো বেড়ালের মত হাঁ করে থাবা চাটছি। অবশেষে খাবার এল। অপূর্ব রান্না। আলুর দমে আলুর রং পুরো লাল, সঙ্গে উপরে চিজ ছড়ানো। দেখেই আমি ছ্যাড়ানোর ভয়ে একপিস আলু আলাদা করে তুলে নিলাম। অনেকদিন পর ভালো খাওয়া হল। মৌরি চিবোতে চিবোতে উপরে গিয়ে হ্যাহা-হিহি চললো বেশ কিছুক্ষণ। ঘরটা বেশ বড়। দুইপ্রান্তে দুটো বিছানা কিংসাইজ। একটায় 'জয় শ্রীরাম'-পুর-এর তিন ব্যাক্তি, আর আরেকটিতে ইন্দ্র-আমি-দেবজিত। যথারীতি সব জায়গার মত মাঝে পেস্ট হবার কপাল আমারই। ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে কল্পেশ্বর মন্দিরের ৩০০ মিটার আগে অবধি গাড়ি যায় কাজেই নো চাপ।

রাত্তিরে আমার ঘুম আসে কম। পাতলা ঘুম, তার ওপর ছ'জনের মধ্যে আমি সৌনিপ বাদে সবাই নাক ডাকে। অধিনায়ক এখানেও বিরাট কোহলি। আবার জিরো পাওয়ার এর ল্যাম্পও জ্বলছে। শুয়ে পড়ার আধাঘন্টা পর মাথা উঁচিয়ে দেখলাম সৌনিপ বেচারা কোনমতে একদিকে পড়ে আছে। এপাশ ওপাশ করতে করতে তন্দ্রা এসে গেছিল।

P.S: সবার জিন্দেগিই হয়ত সবার ক্ষোভ বয়ে নিয়ে চলেছে। ১৩ আনায় বিক্রি হচ্ছে স্মৃতির গয়না। কিছু খারাপ থাকা আমরা দেখাতে পারি, কিছু পারি না। কিছু ঘা আবার দেখতে পায় শুধু বিশেষ কিছু মানুষ। হাত ধরা সহজ, আমার মত মানুষের ক্ষেত্রে হাত ছাড়াও ততটাই কঠিন। কেউ না বুঝলেও পাহাড় ঠিক বোঝে আর সবার ভাবনায় 'দেখানো পাহাড়প্রেম এর' উপহাস পেরিয়েও বোঝে। তাই যখন বাথরুমে মুখে জলের ঝাপটা মেরে আয়নায় দেখি ভেজা মুখ আর কপালে সুক্ষ্ম ভাঁজের দাগ, মনে হয় ভালো থাকার চেয়ে হয়ত ভালোবাসাটাই বেশি দামী।

"এখানেই থেকে যাও, ঠিক এই পাশটায়

যেখানে বসলে সরাসরি দেখা যায় পাশে থাকা-
আমার থাকুক বাসি শরীর, বাসি মন
খোলা মেঝেয়, এঁটো বাটিতে, আঢাকা"।

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_১৪গুষ্ঠীর_ষষ্ঠীপূজো
#কল্পেশ্বর_মহাদেব
#ভিনরাস্তায়_ভিন্নপথিক
'টি টি টি টি টি টি টিং টিং...টি টি টি টি টি টি টিং টিং ... টি টি টি টি টি টি টিং টিং করে অ্যালার্ম বাজল ঠিক ছটায়। বন্ধ করে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলাম। ছজন আমরা, বাথরুম একটাই। সবাই আজ স্নান-টান করবে বেরোনোর আগে। তাড়া খুব একটা নেই। আজ পুরোটাই গাড়িতে। পিপলকোটি থেকে আমরা যাব হেলাং। ৩৪ কিলোমিটার রাস্তা ন্যাশানাল হাইওয়ে-৭ ধরে। তারপর হেলাং-উরগ্রাম রাস্তা ধরে ১১ কিলোমিটার কল্পেশ্বর। স্থানীয় ড্রাইভাররা বলেছে মন্দির অবধি গাড়ি যায়। আমরা আনন্দেই আছি আজ হাঁটা নেই। একে একে স্নান করে স্যাক গুছিয়ে একেবারে নিচে নেমে এলাম। ব্রেকফাস্ট করে ফার্স্ট এগুনো। জানিনা ভান্ডারীর মর্জি কেমন আছে।
খাবার টেবিলে বসে দেখি ভান্ডারী তৈরি। সে দিব্যি ভালো ঘুমিয়েছে বাকি ড্রাইভারদের সঙ্গে। তবে দিল খুশ নাকি নাখুশ বোঝা যাচ্ছে না। আমরা নাস্তার অফার দিতে বলল 'জি ঠিক হে, আপ জো বোলেঙ্গে'। বুঝলাম এখনও বাউন্সার ধেয়ে আসেনি। সে সোনামুখ করে আলুর পরোটা নিয়ে আলাদা বসল আর আমরা আলু-পরোটা, পুরী আর রুটি মিলিয়েমিশিয়ে নিলাম আর তারপর কফি, আমারটা অ্যাজ ইউজুয়াল ব্ল্যাক। পয়সা মিটিয়ে গাড়িতে উঠলাম। বেশ ঠান্ডা, তবে যে ঠান্ডা কাটিয়ে এলাম তার কাছে নস্যি। রোদ উঠেছে পরীক্ষাশেষের আনন্দের মতন। আজই ইন্দ্রের শেষ রজনী এবারে আমাদের সঙ্গে। ওর বাবা মা আসছেন। রওনা দিয়ে দিয়েছেন হরিদ্বার থেকে সাঙ্গপাঙ্গ সমেত। একটু যেন মন খারাপ হচ্ছে। কেউ কাউকে বুঝতে দিচ্ছি না আমরা। গাড়ি ছুটেছে হাইওয়ে ধরে। মাঝ সকালের উত্তরাখন্ডি হাইওয়ের ধার যেমন সংসার করার করছে নিজের মত। কোন ঘরের বারান্দায় চলছে ভেজা সোয়েটার মেলা, আবার কালভার্টের ধারে গান গাইতে গাইতে হাতে বোনা সোয়েটারের হাতা গুটিয়ে বোতল কাটা দিয়ে জল ছুঁড়ে ছুঁড়ে গাড়ি ধুচ্ছে কোন ড্রাইভার।
SBI পেরিয়ে হেলাং মোড়ে গাড়ি বাঁদিকে বেঁকে ঢুকে গেল হেলাং-উরগ্রাম রোডে। রাস্তা আর পাকা নেই। পাহাড়ি মাটি-পাথরের। ঝুপ করে যেন সভ্যতা থেকে জঙ্গলে ঠেলে ফেলে দিল কেউ। একটু এগিয়েই অলকানন্দার ওপর ভারী সুন্দর এক লোহার ব্রিজ। নীচে খিদে পাওয়া সিংহের মত বয়ে যাচ্ছে সে। রাস্তা জঘন্য। দুলতে দুলতে চলেছি। মাথা ঠুকে যাচ্ছে বারবার। সরু একরোখা চড়াই, সঙ্গে যত্রতত্র হেয়ারপিন বেন্ড আর নরকঙ্কালের মত ছোট-বড় বোল্ডারের পাঁজর। ভান্ডারী খুব খচে গেছে। "ইয়ে কাঁহা ফঁসা দিয়া আপনে। পুরা ফাঁকা ইলাকা হে। কিসি কো কুছ হো গয়া তো ইয়েহি মরনা পড়েগা"। গজ গজ করেই চলেছে। একটু এগিয়েই রাস্তা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকল। হুট করে যেন অন্ধকার জেলে দিল কেউ। সঙ্গে এক অদ্ভুত ঝিমধরা নিস্তব্ধতা। মনে হল কোন মহাজাগতিক পোর্টাল পেরিয়ে অন্য কোন ডাইমেনশনে পৌঁছে গেছি। ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের 'লিসনারস' এর সেই ট্রাভেলোরটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। 'Is there anybody there' বারবার ডেকেও যে সাড়া পায়নি বন্ধ দরজার আড়াল থেকে। তবে হিমালয়ের ভাবনা বরাবরই একটু অন্য রকম। চমকে দেওয়া। একটা বাঁক ঘুরেই সভ্যতার দেখা পেলাম। রাস্তা হচ্ছে। কালো কেউটের মত চকচকে গলা পিচ সমান্তরাল প্রগতিতে শুয়ে আছে মাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান সমেত। কায়িক শ্রমিকদের সমবেত কথা, পিচগলানো ইঞ্জিনের ঘড়ঘড়, আলকাতরার গন্ধ, ঘামেভেজা ধুলোর গন্ধ, রাস্তার ধারের ত্রিপল-ঝুপড়ি-টেন্ট, পোড়া বিড়ি আর কালো তামাকের ছাপঅলা দাঁতেরা জানিয়ে দিল আরেকটু এগিয়েই উরগ্রাম বা উরগম গ্রাম।
পিচরাস্তা শেষ হয়ে রাস্তা আবার কাদামাটির। সদ্যকাটা রামদানার কাজ ফুরোনো কান্ডেরা পড়ে আছে অবহেলায়। জ্বলেপুড়ে খাক হবার অপেক্ষা করছে। রাস্তার ধারের এক দোকানী মহিলা জানালেন কিলোমিটার দুই এই রাস্তা ধরে সোজা গেলেই একটা নতুন ব্রিজ পড়বে। কল্পগঙ্গা ব্রিজ। ওপারে আর ৩০০ মিটার হেঁটে উঠলেই কল্পেশ্বর। গ্রাম ছাড়িয়ে একটু এগোতেই রাস্তা ঢালু হয়ে গেছে, বাঁদিক থেকে নেমে আসা এক ঝরনা বয়ে চলেছে রাস্তার উপর দিয়ে তীব্রবেগে। ওটা পেরোতে গিয়ে হর-কি-দুন ট্রেকে সাঁকরি থেকে তালুকা যাওয়া মনে পড়ছিল। আরও একটু এগোতে ঘন জঙ্গলের মাঝে এক সবুজ ছোট্ট বুগিয়াল হাজির হল আর তার সামনেই অপূর্ব সুন্দর নতুন কল্পগঙ্গা ব্রিজ।

পেরোতে গিয়ে ২০১৩-য় ধ্বংস হয়ে যাওয়া পুরনো রাস্তা আর ব্রিজের অবশেষ চোখে পড়ল। এমন আবেশমাখানো সবুজ আর অপার শান্তির সহাবস্থান আগে দেখি নি। কল্পগঙ্গা যার পৌরানিক নাম হিরণাবতী, তার বয়ে চলা আর পাখির শব্দ ছাড়া একটাই চেনা শব্দ পাচ্ছিলাম, মন্দিরের ঘন্টার। ওই ভাইব্রেশনে যেন চিরকালীন মহাবিশ্বের শাশ্বত রেজোন্যান্স 'ওম' বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কয়েকশো সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছে গেলাম মন্দিরে।

পুরাণ অনুসারে ভীমের সঙ্গে যুদ্ধের পর শিবের জটা পড়েছিল এখানে। সেই জটারূপী মহাদেবের পূজা হয় পঞ্চকেদার যাত্রার পঞ্চম কেদার কল্পেশ্বরে (২১৩৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই মন্দির)। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই জটারূপী পাথরটা একেবারে আসল জটার মত দেখতে এক বিরাট গ্রানাইট 'Monolith' (একটাই একক পাথর)।

পাথররূপী শিবকে ছুঁয়ে হলুদ-চন্দন মাখিয়ে মন ভরানো পুজো দেবার পর পুরোহিত নেগীজি জানালেন যে এখানেই আছে সেই কুন্ড যেখান থেকে মহাদেব সমুদ্রমন্থনে জলদান করেন এবং সৃষ্টি হয় 'চৌদ্দটি অমূল্য রত্নের'। এবার ফেরার পালা। পথে দেখা হল কল্পেশ্বর থেকে রুদ্রনাথ ট্রেকের রাস্তার গেট আর উরগমের 'ধ্যান বদ্রী' মন্দির। একযাত্রায় তিন কেদার আর এক বদ্রী। মন্দ কি?

ফেরার সময় ততটা কষ্ট হলনা। আগে থেকেই রাস্তার আন্দাজ ছিল। মাঝখানে আধঘণ্টায় ঘুরে আসা হল ধ্যান বদ্রী মন্দির। ফেরার পথে টের পাওয়া গেল খিদের টান। রাস্তার ধুলো বেশ এপেটাইজার এর কাজ করছিল। আর কিছুক্ষণ। পিপলকোটি অবধি পৌঁছে লাঞ্চ করে ইন্দ্র বিদায় নেবে। ওখান থেকে যোশীমঠ এক ঘন্টাও না। ওদের GMVN বুক করা আছে। আমাদের নেমে যাওয়া রুদ্রপ্রয়াগ অবধি। দেখা যাক কোথায় গিয়ে শেষ হয় আজকের মত পথ চলা।

P.S: কল্পেশ্বরে গাড়ি থেকে নেমে বনেটে হেলান দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে ভাণ্ডারী। বন্ধুরা "উফ কি অসাধারণ জায়গা" বলছে আর শব্দ পাচ্ছি একের পর এক ক্যামেরার শাটারের। আমি জিজ্ঞেস করলাম - কি? যাবে না পুজো দিতে? বলল - হ্যাঁ যাব, এত কাছে এসেছি একটা কেদার দেখেই যাই। এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করলাম বাড়িতে কে কে আছে? বলল বউ একা থাকে তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে। দুই মেয়ে এক ছেলে। ভারী চিন্তায় আছে, কারণ বউ চতুর্থ সন্তান গর্ভে ধারণ করে আছে এখন। তাই বিপদের আশঙ্কায় বারবার বাড়িতে ফোন করছে হেডফোন লাগিয়ে। বলার সময় মাথাটা নুয়ে দৃষ্টি চলে গিয়েছিল মাটির দিকে। ব্রিজে উঠব, সামনে থেকে চারটে খচ্চর আসছে মালপত্র নিয়ে। সরে দাঁড়ালাম। ভাণ্ডারী বলে চলেছে। যতদূরের ট্রিপ হোক না কেন মালিক মাসে ৫০০০ দেয়। ভেবেছিল আমাদের ট্রিপ শেষ করে জলদি বাড়ি ফিরবে। সে ছমাস ওই ভাড়ার গাড়ি চালায়, ছমাস বন্ধ। কিন্তু মাইনে পায় পুরোই। তাই সে বেশি দাবি করে না, পাছে এটাও যায়। বলতে বলতেই কখন এগিয়ে গেছে খেয়াল করিনি। থেমে গিয়ে তাকিয়েছিলাম নদীর দিকে। ভাবছিলাম আমরা কত মজা করেছি ওকে নিয়ে। মুসৌরির কোন এক নাম-না-জানা কাঠের বাড়ির মাটির উঠোন তখন চোখে ভাসছে। সন্ধে হবে হবে। সদ্যধরানো কাঠের জ্বালের উনুনের ধোঁয়া চোখে এসে লাগল। সানগ্লাস ভারী কাজের জিনিস।

"এতদিন বলোনি তো রূপকথা লিখবে
পাশের পাড়ায় ঘুড়ি ওড়ায় যুবরাজ,
আমার জন্য বাড়ি ফেরো ঘামে ভিজে?
রাত করে, হাতে নিয়ে তারার সাজ..."

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_মনখারাপের_১৫
#ফিরে_আসার_পাঁচকাহন
#পাহাড়_মাখা_ধুলো
সব চরিত্র বাস্তবিক(?)
পিপলকোটির আগেই হেলাং এ দুপুরের খাওয়া সারা হবে। আজ এক বন্ধুকে বিদায় জানানোর দিন। খাওয়ার পরেই ইন্দ্রকে ছেড়ে যাওয়া। ওর বাবা-মা আসছেন। তবে ওনাদের গাড়ি অনেক পিছনে। এই অবধি পৌঁছতে অন্ততঃ ঘন্টা পাঁচেক লাগবে। তাই ও এখান থেকে জোশীমঠ গিয়ে GMVN-এ রেস্ট নেবে। সবাই খেতে বসলাম। আমি আর জয় রুটি। জয়ের শরীরটা একটু খারাপ। জ্বর এসেছে। বাকিরা মিক্সড থালি। ইন্ডিয়ার খেলা হচ্ছে টিভিতে। সবারই মন একটু খারাপের দিকে। দুই মেয়ের বাপ - সুদীপ আর দেবজিত-এর মন টিকছে না আর। এবার ফিরতে পারলে বাঁচে। দেবজিতের মেয়ে এক্কা বাবার সাথে ভিডিও কলে কথাই বলল না। মায়ের হাত ঠেলে সরিয়ে দিল। বিপদ সঙ্কেত। সুদীপের মেয়ে মোহর অবশ্য ছোটো আরও। সে বাবাকে দেখছে নাকি কাকে বুঝতে না পেরে ফোনটায় খাবলা মারল। সৌনিপের কোনও বিকার নেই। তার চোখে পাহাড়ের আফিম। তিন বছরের বেশি পাহাড় ছেড়ে রয়েছিল, তাই কোনোদিকে তাকাবার তার মন নেই। ইন্দ্র বারবার ফোন করছে। আমারো কোন পিছুটান নেই এখনো অবধি। নেই নয়, আছে অল্প। সন্তান নেই, তবে বড় বড় দুই বুড়ো শিশুকে ঘরে রেখে এসেছি যারা মেট্রোর টাইমটেবিলের মত অবুঝ।

হ্যাঁ। পাহাড়ের গল্প শেষ। এবার ফেরার গল্প। আর কিছু ইন্টারেস্টিং নেই। সব একঘেয়ে। ফেরাগুলো যেমন হয় আর কি। একপেশে বক্সিং ম্যাচের মত। মার খেতে খেতে নক আউট। একটু আগে ইন্দ্র নেমে গেল। ওর রুকস্যাক আর পুজোর প্রসাদের ঝোলা আমরা নামিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে হেলাং-এর খাবার দোকান থেকে কেনা এক পেটি জলের বোতল থেকে দুটো। বুঝে নিয়েছি টাকার হিসেব, ফেরত দিয়েছি প্রাপ্য। এখন পিছনে হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পারছি বেশ। তবু কেন পিছনের দরজার কাচ দিয়ে 'না আর দেখবই না' দৃষ্টি বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে রাস্তার দিকে। ছেড়ে আসা রাস্তা কাছ থেকে দূরে যেতে যেতে হিমালয়কে ছুঁয়ে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। মনখারাপ হচ্ছে কি? সামনে বসেছে ভান্ডারীর পাশে দেবজিত। কোলে ব্যাগ নিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। ট্রেক পোলগুলো গাড়ির মেঝেয় গড়িয়ে গড়িয়ে পায়ে চুমু খেয়ে যাচ্ছে। ধপ করে জলের বোতলটা পড়ে গিয়ে জয়ের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। সৌনিপেরও জ্বর জ্বর। ক্রোসিন দিলাম। হাতে মাথা দিয়ে ঘুমোলো সে। বাইরে তখন মাঝদুপুরের ঝিম। রোদের অত্যাচার সইতে না পেরে তার মা তাকে আচ্ছা করে কানমলা দিয়েছে। তার চোখে বাষ্প। পাহাড়ের গায়েও তার ছাপ। পেরিয়ে গেলাম সেই একলা গাছ। চোখের মণির মত তাকে মাঝখানে রেখে। আগেরবারে গাড়ি দিয়ে এঁকেছিলাম ওপরের পাতার কাজল, এবার নিচের পাতাটা এঁকে দিয়ে যাচ্ছি। রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছতে অন্ধকার হবে।
চা-তেষ্টা পাচ্ছে। ভান্ডারীকে বলতে বলল রাস্তায় এক দোকানে খাওয়াবে বলে রেখেছে ফোনে। সেখানে তার এক দোস্তও দাঁড়াবে। আড্ডা হবে

কিছুক্ষণ। রাস্তার ধুলোর সঙ্গে ভিজতে চাওয়া পাহাড়ের পাতলা কুচি কুচি বাষ্প মিশে গাদা গাদা অ্যামিবয়েড এঁকে রেখেছে গাড়ির জানালায়। চামোলি পেরিয়ে দেখা হল জ্যামে আটকে থাকা কাকিমাদের গাড়ির সঙ্গে। কাকু আমায় চিনতে পেরে হাত নাড়লেন জানলা দিয়ে। কাকিমা হেসে মোবাইল বের করলেন দেখলাম, ছেলের কাছে ফোন যাবে এবার। সে খবর দিয়েছে অনেক আগেই পৌঁছে গেছে জোশীমঠে। রাস্তা পেরিয়ে চোখে পড়ল চা-দোকানের হাল। পাহাড়ি ঢালে অর্ধেক ঝুঁকেথাকা একটা বয়স্ক ঝুপড়ি। আরেকটা গাড়ি থেকেও কিছু বয়স্ক মহিলা পুরুষ নেমে একটা খাটিয়ায় বসে আছে। সামনে বস্তায় রাখা আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, শিকড়বাকড়। সব দোকানীর নিজের ক্ষেতের। যদি কিছু বিক্রি হয় এই আশায় সাজিয়ে রাখা। দুটো কালি আর চারটে দুধবালি চায়ে অর্ডার দেয়া হল ছ'জনের জন্য। পয়সা বের করতে গিয়ে মনে পড়ল একটা দুধ-চা ক্যান্সেল করতে হবে। আমরা এখন পাঁচজন। মনের পেন্ডুলামে আরেকটা জোরে টোকা মেরে কেউ অসিলেশন বাড়িয়ে দিল। একজন কম, একজন কম। দিন নিভে আসছে হুট করে। ফেরায় কি ঘা শুকোয় নাকি রক্ত পড়ে বেশি? এখনও বুঝিনি।

রুদ্রপ্রয়াগ ঢোকার আগে জানা গেল প্রয়াগ দেখা হবে না। এখন বাইপাস দিয়ে ওয়ান ওয়ে। আমাদের নদী ক্রস করে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে সিটির বাইরে কোথাও থাকতে হবে। গাড়ির ভিতর থমথম করছে। একটা কথাই ঘুরে ফিরে আসছে ইন্দ্র থাকলে ভালো হত। ওর মত মজা করতে আমরা সত্যি কেউ পারিনা। একটা ড্রাগ উইথড্রয়াল রিহ্যাব-এর মত পরিবেশ। একটার পর একটা গাড়ি চলেছে লাইন দিয়ে। হেডলাইটের কাটাকুটি আর চোখ মারামারি চলছে। পিছনের দরজার জানালায় আলো পড়ে ভান্ডারীর সিটে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ছায়া পড়ছে দেবনাগরীতে লেখা "ভান্ডারী বন্ধু"-র, সঙ্গে Mob. 9536385841-এর পরের লেখাগুলো উঠে গেছে। ঠিক ধ্বসে যাওয়া পাহাড়ি রাস্তার মত। এখানে এখন চারধাম প্রজেক্টের রাস্তা হচ্ছে। ধুলো পাক খেয়ে উঠছে। সৌনিপ আর জয় গল্প জুড়েছে অনেকক্ষণ পর রুদ্রপ্রয়াগের বিখ্যাত ম্যানইটার চিতার শিকার কাহিনি নিয়ে। জিম করবেট কিভাবে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে সাহিসকতার সঙ্গে তাকে হত্যা করেন তার রোমহর্ষক বর্ণনা। নদী পেরোলাম। গাড়ি এসে থামল প্রথমদিন যাওয়ার সময় যেখানে লাঞ্চ করেছিলাম সেই হোটেলে। কিন্তু দামে বা ঘরে পোষালো না। তাই আরেকটু এগিয়ে হোটেল "সাংগ্রি লা"। সুন্দর এক ফোর-বেড রুমে ঠাঁই মিলল রাত্রিবাসের। কাল হরিদ্বার।

P.S.: হেলাং এ খেতে বসার আগে সুদীপকে দেখছিলাম। বাইরে পাতা চেয়ারে বসে ভিডিওকল করছিল মোহরকে। ফোন রাখার পরেও তাকিয়ে স্ক্রিনের দিকে। কখনও কখনও আমরা বুঝে পাইনা মায়া আগে, নাকি মুক্তি। এই সাতদিনে টাগ-অফ-ওয়ারে মুক্তি এগিয়ে ছিল। আজকের দিনটা আলাদা, আজ মায়া টানছে গায়ের জোরে। মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় গ্রামের বাড়ি বৈঁচি থেকে থাকার বাড়ি রামপুরহাটে আসার সময় ষ্টেশনের কাঠচাঁপা গাছ থেকে পড়ে থাকা ফুল কুড়োতাম। একটু পরে শুকিয়ে যাবে জেনেও। ফেরার গন্ধ কি কাঠচাঁপার মত?

"লুকিয়ে রাখি ঘাস বাঁদিকের বুকপকেটে
কিছুতো একটা সবুজ থাক,
দলছুটের সালতামামি শেষ হলে
যদি পারিস, তোর দলে আমায় রাখ"।

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_১৬_কলা_পূর্ণ
#খেল_খতম_পয়সাও_খতম
#চলো_রে_ভক্তোঁ_বদ্রীনাথ_ধাম
(অন্তিম পর্ব)

আর বেশি জ্বালাব না। এই শেষ। এটা একটু বড় করে লিখে নিই, তারপর আর না। এবার খতম, দি এন্ড, যাকে বলে ফুল খাল্লাস। আগের পর্বটা নাকি বেশ মনখারাপের ছিল? মামা-ভাগ্নে পাহাড় এর মামা বা ভাগ্নে কোন পাথরটা বড় জানিনা, সেইটা নাকি বুকের উপর চেপেছে অনেকের। তা বাপু আমি কী করব, মন আমাদের সবার খারাপ ছিল। সেটাই লিখেছি। পড়ে কার কী হল তার দায় আমার না। যাই হোক, ঘটনায় আসি।

তো আমরা 'সাংগ্রি লা' হোটেলে বডি ফেললাম। চারবেড রুম হাজার টাকায়। ম্যানেজার জানাতে ভুলল না সিজনে এই রুম তিনহাজার নেয়। যাইহোক খাসা ব্যবস্থা। দুটো বড় বড় ছয় বাই সাত খাট। খাটের মাথার দিকে উঁচু তক্তাটায় আবার প্যাড দেয়া। যাতে ঠুকে গেলে ব্যথা না লাগে। তবে এই বড় দুখানা খাটের ঘরে খাটে প্যাডের কী প্রয়োজন বুঝলাম না। যাই হোক মাথা না ঘামানোই ভালো, মাথার ঘামের অনেক দাম, পায়ে ফেলার মত কিছু রাখতে হবে নাহলে রোজগার হবে না সৎপথে। রাতের খাওয়া চমৎকার। রুটি, চিজ দেওয়া ছোলা, আলুর দম। সবাই যে যার মত ফোনে ব্যস্ত। নেট আছে। খুললেই টুং টাং মেসেজ। ভান্ডারী দেখলাম খুশিতে। এবার বাড়ি ফিরবে সে, পরিবারের কাছে। কে জানে বাড়ি ফিরে ছোট মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে কোথায় চরতে বেরোবে। সকালে তাড়াতাড়ি বেরোবে জানিয়ে সে বিদায় নিল। আমরা রাস্তায় হালকা পায়চারি করে দূরের টিমটিমে আলোয় সাজানো পাহাড়ের গায়ে রাতের রুদ্রপ্রয়াগ দেখে ঘরে ফিরলাম।

সকাল সাতটায় বেরোনো। আজ কথা আছে দেবপ্রয়াগে একটু থামা হবে। আগেরদিন প্রয়াগ ভালো করে দেখা হয়নি। যদিও ভাণ্ডারী বলেছে বেশি সময় দিতে পারবে না। ছটায় তৈরি হয়ে নিচে নেমে দেখি ওই সকালে ঠাণ্ডায় একটা পাতলা ফুলহাতা গেঞ্জি পরে ভান্ডারী গাড়ি ধুচ্ছে পরম মমতায়। মনে হল অনেকদিন পর যেন তার পোয়াতি বউকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে মনভরে। আমরা এক কাপ করে চায়ের অর্ডার দিয়ে বসলাম। চা খেয়ে বেরোনো হল সাতটা কুড়িতে। রাস্তা ভালো গাড়ি ছুটছে হুহু করে। শ্রীনগর পৌঁছে ব্রেকফাস্ট করা হবে। আজ সবাই ভালো মুডে। বলা হয়নি। গতকাল আসার সময় সন্ধ্যেবেলা ভাণ্ডারীর ভক্তি উছলে পড়ছিল। তাই সে ভক্তিগীতি চালিয়েছিল গাড়িতে। আজো সেগুলোই চলছে রিপিট মোডে। তার মধ্যে সেরার সেরা অলিভেরা হলঃ "চলো রে ভক্তোঁ বদ্রীনাথ ধাম"। কি সব এপিক এপিক গান- "দুনিয়া চলেনা শ্রীরাম কে বিনা/রাম কি চলেনা হনুমান কে বিনা", "এয় দ্বারপালোঁ/কনহাইয়া সে কেহদো/মিলনে সুদামা গরীব আ গয়া হে", "মাতা শেরোঁবালি/উঁচে ডেরোঁবালি/ বিগরে বানায়ে মেরা কাম/নাম রে"...ইত্যাদি প্রভৃতি এইসব গান অনেক্ষণ চলছিল। মাঝখানে একবার নেমে আমি হ্যাল খেয়ে বেশ জোরেই গাইছিলাম -"চলো রে ভক্তোঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ...", পাশ থেকে একটা নেড়ি মুখ উঁচিয়ে ভেঙিয়ে দিল-"ভৌ উঁ উঁ উঁ...", গাড়িতে উঠেই সুদীপকে বললাম, ভাই কুমার শানু চালা।

শ্রীনগর ঢুকলাম নটার পর। খিদেয় পেটে হারকিউলিস ডন মারছে। একটা খাসা রেস্টুরেন্ট দেখে গাড়ি থামালো ভান্ডারী। আজ ইন্দ্র নেই। তাই কেউ আর বলল না, "থোড়া আগে চলিয়ে"। পানসি ভিড়ে যেতে নেমে পড়ল বনিকের দল। আমি মশলা ধোসা আর বাকিরা লুচি আর চানা নিল। দেখলাম আরেকটা টেবিলে ইন্ডিয়াহাইকস-এর একটা দল নতুন ট্রেকের রেকি করে ফিরছে। সন্ধ্যা আর আশীষকে চিনতে পারলাম কিন্তু কথা বলা হল না। আমাদের আগেই ওরা বেরিয়ে গেল। পেটপুরে খেয়ে সম্বরের ঢেঁকুর তুলে গাড়িতে উঠলাম। ইঞ্জিন অন হতেই বেজে উঠল "ম্যায় দুনিয়া ভুলা দুঙ্গা/তেরি চাহত মেঁ"। গানটা শুনতে শুনতেই লিখছিলাম #যা_দেখি_তাই_লিখির পর্ব-৩ #মিসিং_ডায়রি।

এরপর আর কিছু না। সরলরেখার সাথে মাঝে মাঝে জটিলরেখার পথ মিলে মিশে নেমে আসা। বাঁদিকে সবুজ আলকাতরা মেখে পাশে পাশে চলেছে অলকানন্দা। একটা বাঁক ঘুরতে দেখি সামনে রাস্তার কাজের জন্য গাড়ি খিদে পাওয়া শুঁয়োপোকার মত আস্তে আস্তে ধুলো খেতে খেতে চলেছে। বাঁদিকে নেমে গেছে গভীর গর্জ। দুটো পাহাড় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাদের মাঝখানে আকাশ যেন পাতলা বাঁশের বাখারিতে বসতে গিয়ে মাঝখান থেকে ভেঙে ফেলেছে, আর কেটে গিয়ে হিমোসায়ানিন মাখা ডিপ নীল রক্ত বেরোচ্ছে। এদিকে এক মাথায় ঝুড়িভর্তি পাথরঅলা ধুলোমাখা ঘাঘরা চোলির মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে কাঁধের সেলাই খুলে যাওয়া ঝ্যালঝেলে ফুলহাতা শার্টের হাতের গামছা। তাকিয়ে থাকা যায়না এমন ভালো চাওয়ার দিকে বেশিক্ষণ, নিজেকে খালি লাগে। ভাগ্যিস ভালোবাসা কিনতে পাওয়া যায় না শপিং মলে। ভাগ্য ভালো গাড়ি ছুটল। কষকষে প্রেম-মাখা চোখ-তাকিয়ে খেয়ে কাগজটা চেটে নিয়ে পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলাম জানলা দিয়ে মনে মনে।

নেক্সট স্টপ দেবপ্রয়াগ। ঠিক প্রয়াগের জায়গায় এখন একটা সুন্দর দোতলা ভিউপয়েন্ট হয়েছে। ভান্ডারীর কাছে পনের মিনিট সময় চেয়ে নেমে এলাম। যতই দেখি আর ছবি তুলি মন ভরে না কিছুতেই। নিচে নদীর পাড়ে কোন এক দেহের আগুন সমাধি হচ্ছে। পোড়া মানুষের গন্ধ নিয়ে পাক দিয়ে উঠে আসছে সাদা ধোঁয়া। যাক, মিশে যাক পাহাড়ের গায়ে পড়ে আসা সময়ের নামতা মুখস্ত বলে। উঠে এলাম। যন্ত্রের মত গাড়িতে বসলাম। হাইওয়ে বেয়ে ছুটল "ভান্ডারী বন্ধু"। দেড়টা নাগাদ ব্যাসী এলাম। সেই যাওয়ার সময় জল খাবারের দোকানেই থালি আর স্যান্ডুইচ ভাগ করে খেয়ে উঠে এলাম। মন আর মন-এ নেই।

হৃষীকেশ-এ নামা হল দেবজিতকে লছমন ঝুলা আর বিদেশিনী দেখানোর জন্য। আমরাও মাঝখানে দু-একটা বিকিনি বেবস দেখে চোয়াল ঝোলাইনি বললে সরাসর ঝুট হবে আর আমি কালো কাউয়ার কামড় খেতে নারাজ। লছমনঝুলায় লোকের কালো মাথা, খান দশেক গরু, কিলো বিশেক গোবর, বাঁদরের সার্কাস দেখে, খান সতেরো কনুই, কুলফি মালাই আর ঘটিগরম খেয়ে গরমে কুলকুল ঘামতে ঘামতে পার্কিং লটে ফিরে এলাম। এবার সোজা হরিদ্বার।

হরিদ্বারে বলার মত ঘটনা কিছুই নেই। পিওর ল্যাদ, ক্লিশে কিন্তু অভ্যেসে দাদা বৌদির দোকানের নিরামিষ খানা খেয়ে, ঘরের লোকেদের দাবিমত হাবিজাবি কিনে কোমরভাঙার ব্যবস্থা করে, সুদীপের নাকডাকার আওয়াজে ঘুমোতে না পেরে ব্যাটাকে মার্ডার করার ইচ্ছে চেপে রেখে, ভোরভোর দিল্লির জন্য জনশতাব্দী ধরে লাগেজ রাখার জায়গা না পেয়ে বাংলায় ঝগড়া করে কেটে গেল। অতঃপর দিল্লি এসে রিটায়ারিং রুমে স্নান, দোকানের ফ্রায়েড রাইস-চিলি চিকেন খেয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম এবং বনগাঁ লোকালের মত মারামারি করে রাজধানীতে ওঠা। লাগেজ সামলে বসে কয়েক দান টোয়েন্টি-নাইন খেলে বোর হয়ে গিয়ে বারবার "চলো রে ভক্তোঁ", "দুনিয়া চলেনা", "এয় দ্বারপালোঁ" ইত্যাদি গাওয়া এবং ইউটিউব দেখা এবং হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়া করতে করতে কখন হাওড়া পৌঁছলাম মালুম হল না।
P.S: এরপরেও ভাবছেন পুনশ্চ আছে? জি হাঁ। কলকাতা নেমে প্রিপেড ট্যাক্সিতে চেপে যখন হাওড়া ব্রিজে উঠছি ডিরেক্ট অফিস যাব বলে তখন কে কী ভাবছিল জানি না, আমি ভাবছিলাম বাড়ি গিয়ে মাকে দেখতে পাব। একেই বলে ভেতো বাঙালির অ্যাডভেঞ্চার, বাড়ি থেকে বেরিয়েও আনন্দে কাঁদে, বাড়ি ঢুকেও। উফঃ। শেষ, আপনারা বাঁচলেন আমিও।
"তীর বেগে ছুটে আসে সময়
ভাঙা বারান্দার শার্সি আর ধুলো মাখা রোদকুচি বেয়ে,
সাজিয়ে রাখো মরশুমি স্মৃতির তাক অযত্নে-
শুধু আয়না থাক তোমার পথ চেয়ে ।"

- সমাপ্ত -

~ কেদারের আরও ছবি ~

জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন পাহাড়ে না গেলেই ডিপ্রেশনে ভোগেন। ট্রেকে বেরোলেই ফের চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। কিন্তু ফিরে এসে লিখতে বসলেই আবার ল্যাদ খান। তবে এর পরেও কষ্টেসৃষ্টে যেটুকু লেখেন তা স্রেফ "আমাদের ছুটি"-র জন্যই। বাড়িতে চমৎকার রুটি বানান। মাঝেমধ্যে রান্না করতেও ভালোবাসেন।

বান্দরবানের পাহাড়ে বর্ষা অভিযান

এ.এস.এম. জিয়াউল হক

ঈদের ছুটিটা কোথায় কাটাবো চিন্তা করতে করতেই মাথায় আসল বান্দরবানের কথা। বর্ষার সময় জুমের মৌসুমে পাহাড় এখন পুরো সবুজ। যদিও ঈদ পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পারবোনা ভাবতেই মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু সবুজের টানও তো উপেক্ষা করতে পারছিনা। অতএব আগষ্টের ২৬ তারিখ রাতের বাসে টিকেট কেটে ফেললাম। আমরা পাঁচজন, একজন আবার চট্টগ্রাম থেকে দলের সঙ্গে যোগ দিবে। ঈদের মৌসুম বিধায় ৩১ তারিখে ঢাকায় ফিরবার টিকেটও আগে থেকেই করে ফেললাম।

বাস ছাড়ল এক ঘন্টা দেরীতে। আমাদের ট্রেকিং রুট আগে থেকেই নির্ধারণ করা, এমনকি চার দিনের কোন রাত কোন উপজাতি পাড়ায় কাটাবো, তাও আগে থেকে ঠিক করা। তাই সবকিছু সময়মত হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। এক ঘন্টা দেরীতে যাত্রা শুরু করাতে তাই প্রথমেই একটু ভড়কে গেলাম। তার ওপর পথে জ্যামে পড়ার সম্ভাবনা তো আছেই।

চট্টগ্রাম হয়ে বান্দারবান আমরা সময়মতই পৌঁছে গেলাম। ভাগ্য ভালো, পথে কোনও জ্যামেই পড়তে হয়নি। বান্দারবান পৌঁছেই সোজা চলে গেলাম রুমা বাস স্ট্যান্ড। সেখানে দেখা হল আমাদের চট্টগ্রামের সহযোগী অনন্ত-র সঙ্গে। ও একদিন আগেই বান্দারবান চলে এসেছে। তাড়াহুড়ো করে বাসে উঠে পড়লাম। দুপুর তিনটের ভিতরে রুমা বাজার পৌছতে হতে হবে, না হলে আর্মিরা রুট পারমিট দিবেনা পরবর্তী গন্তব্যের জন্য। বাসে পরিচয় হল এক দম্পতির সঙ্গে, তাঁরা প্রথমবার বান্দারবান এসেছেন। কোথায় যাবেন, কিছুই জানেননা। আমাদের সঙ্গে বাসে উঠে পড়লেন তাঁরাও।

বাস রুমা গ্যারিসন পৌঁছতে দুপুর দুটো। সেখান থেকে আবার চাঁদের গাড়ি করে যেতে হবে রুমা বাজার। আমাদের দুর্ভাগ্য রুটের গাড়ি ছেড়ে গেছে একটু আগে। বাধ্য হয়ে যখন হেঁটে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখনই দেখি বাসের সেই দম্পতি একটা চাঁদের গাড়ি রিজার্ভ করে ফেলেছেন। লিফট চাওয়ার আগেই তাঁরা আমাদের গাড়িতে উঠে পড়তে বললেন। বলামাত্রই আমরা আর সঙ্গে ঢাকা থেকে আসা আরও তিন জনের একটি দল উঠে পড়ল। আধা ঘন্টার মধ্যেই আমরা রুমা বাজার পৌঁছে গেলাম। আমাদের পরবর্তী কাজ গাইড ঠিক করা আর আর্মি ক্যাম্পে রিপোর্ট করা। বাজারে দেখা হয়ে গেল পূর্বপরিচিত নির্ভরযোগ্য গাইড আপেল-এর সঙ্গে। ওর অবশ্য আগে থেকেই অন্য ট্যুরিষ্টদল ঠিক হয়ে থাকার জন্য আমাদের সঙ্গে যেতে পারলো না। তবে ওর পরিচিত বম ছেলে কাপখুম-কে ঠিক করে দিল আমাদের গাইড হিসেবে। খাওয়া দাওয়ার কথা ভুলে ছুটলাম আর্মি ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। সেখানে রিপোর্ট করে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য বগা লেক। এখানেও জীপ রিজার্ভ করতে হবে। ওই দম্পতি আর ভিতরে যাওয়া সমীচীন মনে করলেন না। তাঁরা রুমা বাজার থেকে রিজুক ঝরনা দেখে ঢাকায় ফিরবেন। তাঁদেরকে বিদায় দিয়ে আপেলের দল সহ আমরা একটা জীপ ঠিক করলাম। ঢাকা থেকে আসা অন্য তিনজনের দলটা ঝিরি পথে বগা লেক যাবে। অতএব তারাও বিদায় নিল।

বগালেকের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। বিশেষ করে বর্ষার সময় জীপ একদম লেক পর্যন্ত যায়না। বগা পাহাড়ের নিচে নামিয়ে দেয়। ফোর হুইল ড্রাইভের ঝাঁকুনি আর সামনের খাড়া রাস্তা দিয়ে ওঠা-নামার ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে হৃৎপিণ্ড হাতের ভিতর নিয়ে আমরা বগা পাহাড়ের নিচে পৌঁছলাম। এখান থেকে ৪০০ ফিট ওপরে হেঁটে উঠতে হবে। দেরী না করে সবাই একটা বাঁশ নিয়ে রওনা হলাম। অনেকদিন পর ট্রেকিংয়ে এসে খাড়া পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে আমাদের সবারই জিভ বেরিয়ে গেল। কিন্তু পাহাড়ের ওপর থেকে পুরো বগা লেকের দৃশ্য দেখে সবাই ক্লান্তি ভুলে গেলাম।
এখানে আবার আর্মি ক্যাম্পে রিপোর্ট করে চললাম রাতের আশ্রয়ের সন্ধানে। বগা লেকে এখন অনেকগুলো ইকো কটেজ হয়েছে। লেকের পাড়ে একটা কটেজ খুব পছন্দ হল। সেখানে ব্যাগপ্যাক রেখে কটেজের মালিককে খাবার রান্না করতে বলেই ছুটলাম লেকের উদ্দেশ্যে। ঠাণ্ডা পানিতে অনেকক্ষণ গোসল করে সারা দিনের ক্লান্তি ভুলে গেলাম। কটেজে ফিরেই ছুটলাম খাওয়ার জন্য। এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে সামান্য আলু ভর্তা, ডিমভাজি আর জুমের চাল দিয়েই কয়েক প্লেট ভাত খেয়ে ফেললাম।
সন্ধ্যায় আপেলসহ গেলাম পাশের ছোট একটা পাহাড়ে। সেখান থেকেও পুরো বগালেকের দৃশ্য দেখা যায়। রাতে ফিরেই তাড়াতাড়ি বিছানায় গেলাম। তার আগে লেকের পাড়ে কটেজের বারান্দায় কিছুক্ষণ আড্ডা দিতে ভুল হলনা।

পরদিন খুব ভোরেই উঠে পড়লাম। ইচ্ছা ছিল পাঁচটার ভিতর বেরোনোর, কিন্তু হালকা কিছু খাবার খেতে খেতে ছটা বেজে গেল। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সরকারিভাবে স্বীকৃত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড় চূড়া কেওক্রাডং। সমুদ্র সমতল থেকে এর উচ্চতা ৩২৩৫ ফিট। বগা লেক থেকে কেওক্রাডং-এর পথ পুরোটাই ওপরদিকে ওঠা। মাঝে অল্প কিছু সমতল রাস্তা আছে। শীতের সময় এই রাস্তাতে জীপ নিয়েও আসা যায়, সেই রাস্তা ধরেই আমরা এগোচ্ছি। যেতে যেতে চিন্তা করছিলাম, প্রথম যখন এদিকে কোনও রাস্তা ছিলনা, সার্ভেয়াররা যখন বাঁশ কেটে কেটে পথ করে নিতেন পাহাড়ের উচ্চতা মাপার জন্য, তখন তাঁদের কতটা কষ্ট হত, তার ওপর বন্য জানোয়ারের আক্রমণের ভয় তো ছিলই।
যাই হোক, হয়তো তাঁদের কাছ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে একসময় আমরা চিংড়ি ঝরনা পৌঁছে গেলাম। ঝরনাটি পাহাড়ের ওপর থেকে বেয়ে এসে ঝিরিতে পড়েছে। কেওক্রাডংযাত্রীদের পানির প্রধান উৎস এই ঝরনাটি। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম আমরা। আমি, শুভ আর অনন্ত পাথর ডিঙিয়ে ঝরনার একদম নীচে চলে গেলাম। ঝরনার ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে নিলাম।
আমাদের পরবর্তী গন্তব্য দার্জিলিং পাড়া। কেওক্রাডং এর একদম নিচেই এই বম পাড়ার অবস্থান। পথে কয়েক জায়গায় বিশ্রাম নিয়ে আমরা দার্জিলিং পাড়া পৌঁছলাম। সঙ্গে করে আনা ছোট পেনি স্টোভে কফি বানাতে বসলাম। প্রচণ্ড বাতাসে অনেককষ্টে কফি বানালাম। সব ক্লান্তি দূর করে দিল কয়েকচুমুক কফিতে। এরপর সোজা কেওক্রাডং চূড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা।

কেওক্রাডং চূড়ায় পৌঁছে অভিভূত হয়ে গেলাম। সামনের দিগন্তবিস্তৃত পাহাড় চূড়া আর অনেক নিচের মেঘের আনাগোনা দেখতে খুবই ভালো লাগছিল। কয়েকবার মেঘ এসে আমাদের ভিজিয়ে দিয়ে গেল। তার ওপরে রয়েছে বাতাস। ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকলাম।

জুমচাষের মৌসুমে চারদিক একদম সবুজ। ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে নিচের দার্জিলিং পাড়া, পাসিং পাড়া, অনেক দূরের সুনসান পাড়া, সাইকত পাড়া। এখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে সামনের দিকে রওনা দিলাম। এবার আমাদের নামতে হবে। তাই কিছুটা প্রশান্তি ছিল মনে। পরবর্তী গন্তব্য বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু গ্রাম পাসিং পাড়া।

পাহাড়ের একটি উপত্যকায় গ্রামটি অবস্থিত। কয়েকঘর উপজাতির বাস। সামনে আদিগন্ত পাহাড়চূড়া আর রয়েছে প্রচণ্ড বাতাস। এক কাপ চা খেয়ে আমরা সামনের দিকে হাঁটতে থাকলাম। পাড়ার সঙ্গেই রয়েছে একটি স্কুল। সামনে ছোট মাঠ। চারপাশে পাহাড় আর এর ঠিক মাঝখানে এমন একটি স্কুল দেখে আমারই ইচ্ছা করছিল স্কুলে ভর্তি হয়ে যেতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আগ্রহ নিয়ে দেখছে আমাদের। সঙ্গে করে আনা চকলেট দিলাম ওদের। লাজুক ভঙ্গিতে সেগুলো নিল। ইচ্ছা করছিল পাসিং পাড়াতেই আজ রাতটা কাটিয়ে দিই, কিন্তু রুটপ্ল্যান বিবেচনা করে আর ঈদের মৌসুমের পর্যটকদের ভিড় এড়ানোর জন্য রওনা দিলাম জাদিপাই পাড়ার উদ্দেশ্যে।

জাদিপাই পাড়ায় আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে জাদিপাই ঝরনা। অনেকের মতে এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর ঝরনা, আর বর্ষায় এর আসল সৌন্দর্য ফুটে উঠে। আমাদের এবারের ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য বর্ষায় এই ঝরনার রূপ দেখা।

জাদিপাই পাড়াতে এক আদিবাসী পরিবারের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হল। জুমে আদার চাষ করে এই পরিবারের কিছু টাকা লাভ হয়েছে, সেখান থেকেই কাঠের এই নতুন বাড়িটি করেছে তাঁরা।

ব্যাকপ্যাক রেখে ছোট ডে-প্যাক, শুকনো খাবার, পানি আর কিছু কলা সঙ্গে নিয়ে আমরা রওনা দিলাম জাদিপাই ঝরনার উদ্দেশ্যে। পাড়া থেকে একঘণ্টার হাঁটাপথ। আগের রাতে বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা কিছুটা পিচ্ছিল। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে আমরা খাড়া পথ বেয়ে নামতে থাকলাম। হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে একটা ভুট্টার ক্ষেতে পৌঁছলাম। এখান থেকে সামান্য ওপরে উঠেই জাদিপাই-এর সবচেয়ে বিপদজনক রাস্তা শুরু। ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে খাড়া নামতে হবে অনেকখানি রাস্তা। সামান্য পা পিছলালেই অনেকখানি পথ গড়িয়ে পরতে হবে। ইরাজ ভাই একদম শেষ পর্যন্ত এসেও নিচের অংশটুকু আর নামলেন না।

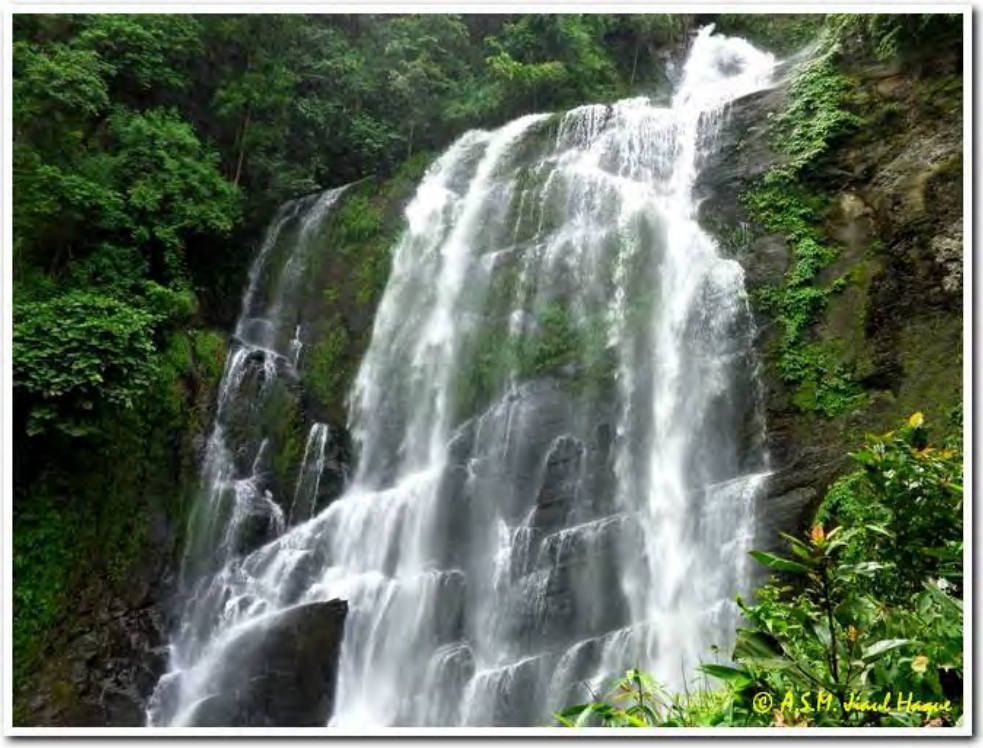

ঝরনার নীচে এসেই চোখ জুড়িয়ে গেল। অনেক ছবি দেখেছি জাদিপাইয়ের, কিন্তু ইরাজ ভাই-এর কথাটাই সত্যি মনে হল, "ছবি মিথ্যে কথা বলে।" কী তার বিশালত্ব, আর কী তার গর্জন! বর্ষার সময়ে জাদিপাই-এর এই রূপ আর শীতের সময়ে তার শুষ্কতা ভাবলে অবাক হতে হয়। বাতাসের প্রচণ্ড তাণ্ডবে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে মনে হচ্ছিল কোনও একটা টর্নেডোর মাঝখানে এসে পড়েছি, এখনই উড়িয়ে নিয়ে যাবে!

পানির ছিটের জন্যে ক্যামেরা বের করতে পারছিলাম না। অনেক কষ্টে কিছু ছবি তোলা হল। গোসল করতে করতে ঝরনার একদম নীচে চলে এলাম। হঠাৎ দেখি, ঝরনার ডানপাশের বেশ কিছু অংশ পানির চাপে মাটিসহ ধ্বসে পড়ল। বেশীক্ষণ আর পানিতে থাকার সাহস করলাম না। ওপরে উঠে একটা শুকনোমত জায়গায় সঙ্গে করে আনা বিস্কিটের প্যাকেট শেষ করলাম। এবার ফিরবার পালা। হাচড়েপাঁচড়ে ওপরে উঠে এসে পুনরায় জাদিপাই পাড়ার উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করলাম। আসার সময় নামার রাস্তা ছিল, এবার পুরোটাই খাড়া রাস্তা। বিশ্রাম নিতে নিতে পাড়ায় এসে পৌঁছলাম।

গোসল করে, খাওয়াদাওয়া করে বিকেলবেলাটা অলসভাবেই কাটল। পাড়ার গির্জার গেটে বসে দিগন্তজোড়া পাহাড় আর মেঘের আনাগোনা দেখলাম। রাতের খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। রাতের খাবার ছিল কচি বাঁশের তরকারি, বাঁশকোড়ল, বাঁশের স্যুপসহ স্থানীয় খাবার।

পরদিন ঈদের দিন। খুব ভোরবেলা উঠে রওনা দিলাম সুনসান পাড়ার উদ্দেশ্যে। এখানেও খাড়া পাহাড় বেয়ে নামতে হবে। রাস্তাও আগের দিনের চেয়ে অনেক সরু আর পিচ্ছিল। কিছু কিছু জায়গায় খাড়া ঢাল নেমে গেছে কয়েকশ ফুট। পা পিছলালেই আর দেখতে হবেনা। যাই হোক, নিরাপদেই আমরা পাড়ায় চলে আসলাম। কাপখুম গ্রামের কারবারীর ঘরে আমাদের থাকার ব্যাবস্থা করল। ব্যাকপ্যাক রেখেই গামছা আর বাঁশ

নিয়ে আমরা রওনা দিলাম আরেকটি ঝরনার উদ্দেশ্যে। বম ভাষায় এর নাম 'তুব্লং', এটি বাংলাদেশের একমাত্র ডাবল ফলস, মানে পাশাপাশি দুইটি ঝরনা একসঙ্গে বয়ে চলেছে। রেমাক্রি খাল আর রুমা খাল থেকে এই ঝরনাদুটির উৎস। পাড়া থেকে এক ঘন্টার রাস্তা। কাপখুমসহ আমরা তিনজন রওনা দিলাম ঝরনায়। বাকি দুজন কারবারীর বাসায় থেকে গেল, পায়ে ব্যথার জন্যে। জুম-এর রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে গেলাম ঝরনার উদ্দেশ্যে। এই বছর এই এলাকায় জুম চাষ হওয়ার জন্যে রাস্তা মোটামুটি পরিষ্কার। অন্যথায় গতবছর পর্যন্ত এখানে আসতে হলে বড় বড় শনক্ষেতের ভিতর দিয়ে আসতে হত, শনের কাঁটায় শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হত। নিরাপদেই আমরা ঝরনার কাছে চলে এলাম।

ওপর থেকেই শোনা যাচ্ছিল ঝরনার গর্জন। নিচে নেমে তুব্লং-এর রূপ দেখে আবারও আমরা মুগ্ধ। পানিতে নেমে পড়লাম। বুকসমান পানি, কিন্তু দুটি ঝরনার মিলিত স্রোতে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছিল না। বাঁশ গেঁথে গেঁথে সামনে গেলাম। ঝরনার নিচে প্রচন্ড স্রোত, গর্জন আর ঠাণ্ডার কাঁপুনি বুকে ভয় ধরিয়ে দেয়। তার ওপর একটু পরপর বাতাস এসে পানির আন্দোলন আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অনেক কষ্টে আমি আর শুভ ঝরনার পানির মূল প্রবাহের ভিতরে ঢুকে গেলাম। এখানে ছোট একটি গুহামত, পানি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের তাণ্ডবে পানি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকল। একটা পর্যায়ে সামনের সবকিছু ঘোলা হয়ে গেল। অনেক কষ্টে আবার বাঁশের সাহায্যে মৃত্যুগুহা থেকে বের হয়ে আসলাম। বিপদ এখানেই শেষ নয়, তীরে ফিরবার সময়, শুভ হঠাৎ করে পানিতে তলিয়ে গেল। ওকে উদ্ধার করতে যেয়ে নিশিতারও একই অবস্থা। অনেক কষ্টে তীরে ফিরল ওরা। পরে আবিষ্কার করলাম যে জায়গাটিতে ওরা ডুবেছিল, দুটি ঝরনার পানির স্রোত ঠিক ওখানটাতেই মিলিত হচ্ছে, ফলে জায়গাটিতে একটা ঘূর্ণির মত সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীতে বর্ষায় যারা এখানে যাবেন, এই জায়গাটি থেকে সাবধান।

এবার ফিরবার পালা। শেষবারের মতো দুর্গম ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবাহিত ঝরনাটির দিকে তাকিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম আমরা। সুনসান পাড়ায় ফিরে এসে খাবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখি কারবারীর বাড়িতে শামুক ছাড়া আর খাওয়ার তরকারি নেই। ঈদের দিন শুধু শামুক খেয়ে থাকবো ভাবতেই সঙ্গে করে আনা প্যাকেট ন্যুডুলস আর স্যুপ রান্না করা হল। রাতে যেভাবেই হোক, একটা মুরগির ব্যবস্থা করতে হবে ভেবে খেয়ে নিলাম।

ওইদিন আমাদের শিডিউলে আরও একটি ঝরনা, জিংসিয়াম সাইতার এবং রুমানা পাড়ার বাদুড় গুহা দেখার কথা থাকলেও আবহাওয়া এবং বাকি দুজনের পায়ের ব্যথার কথা চিন্তা করে ইচ্ছাটা বাদ দিতে হল। মনে মনে একটু আক্ষেপ থেকে গেল, এতদূর এসে এই সামান্য রাস্তাটা আর যাওয়া হলনা। কিন্তু সামগ্রিকভাবেই সবসময় দলের কথা চিন্তা করতে হয়।
রাতে কাপখুম একটি মোরগের ব্যবস্থা করে ফেলল। বনমোরগ আর দেশি মোরগের মিশ্রণ বলা যায় একে। আমাদেরকেই জবাই করতে হল, কারণ উপজাতিরা জবাই করতে জানেনা। নিশিতা গেল রান্না করতে। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করতে করতে খেতে বসলাম। কিন্তু দুই হাত দিয়ে টেনেও এর মাংস ছেড়া যাচ্ছেনা। পাহাড়ি মোরগের এমনই জীবনীশক্তি। কয়েকঘন্টা চুলায় না রাখলে এই মাংস খাওয়া কষ্টকর। যাই হোক, আলু ভর্তা, ডাল আর মাংসসহ ঈদের রাতের খাবারটা সেদিন খারাপ হল না। কারবারীর পরিবারসহ সকলে একসঙ্গেই খেয়ে নিলাম।

পরদিন ফিরে যেতে হবে। ভোরবেলা উঠে পাসিং পাড়ার দিকে রওনা দিলাম। এবার সেই খাড়া পথে বেয়ে উঠতে হবে। সঙ্গে করে আনা শুকনো খাবার আর পানি খেয়ে আমরা উঠতে থাকলাম। পাসিং পাড়ায় পৌঁছে পরবর্তী লক্ষ্য ঠিক করতে বসলাম। আমাদের হাতে দিনের অফুরন্ত সময় বাকি আছে এখনো। তাই পাসিং পাড়ায় রাতে থাকার ইচ্ছা থাকলেও আমরা রওনা দিলাম কেওক্রাডং-এর উদ্দেশ্যে। বগালেক অবধি নেমে ঝিরিপথে রুমা যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। পথে বগামুখ পাড়ায় কারবারীর বাড়িতে রাতে থেকে যাব। খুব দ্রুতই বগালেক নেমে এলাম। লেকে আবার গোসল করে জিম্মুলিয়ান দা'র দোকানে দুপুরে খেয়ে নিলাম। পুনরায় গির্জার পাশের রাস্তা ধরে রওনা দিতে যেয়েই অনন্তর পায়ে ব্যথা চরমে উঠল। বেচারা হাঁটতেই পারছে না। এদিকে বগালেকে ওইদিন রাতে থাকার কোনও ইচ্ছা নেই আমাদের কারও। ঈদের পরদিন হওয়ায়

দলে দলে পর্যটক আসবে ওইদিন। আর এই একটা জিনিস পুরো অভিযানে এড়িয়ে এসেছি। কিন্তু এখন অবস্থা দেখে আর কিছুই করার থাকল না। বাধ্য হয়েই সিয়াম দিদির একটা কটেজ ভাড়া নিলাম। আবারও আক্ষেপ কাজ করছিল আমার, কিন্তু দলের স্বার্থের কথা চিন্তা করে মন খারাপ করলাম না। ভবিষ্যতে আরও অনেকবার আসতে পারবো বগালেকে, কিন্তু পথে একটা বিপদ হলে তখন কি হত?

অনন্তকে বিশ্রামে রেখে বিকেলে আপেলের দল সহ আমি আর শুভ গেলাম পাশের একটা জুম-এর পাহাড়ে। দুপুরে ভরপেট খাওয়ার পর খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে কষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমাদের। কিন্তু ওপরে উঠে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পুরো বগালেক এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল, আর সঙ্গে রয়েছে বাতাস। লেকের পাড়ে পর্যটকদের বারবিকিউ পার্টি আর গানবাজনার উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য এটা একটা মোক্ষম জায়গা।

সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে থেকে আমরা নেমে আসলাম। রাতে আবার লেকের ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলাম আমি। রাতের খাবার ছিল গরুর মাংস। পেট ভরে খেয়ে ঘুম দিলাম।

পরদিন সকালে উঠে আর্মি ক্যাম্পে রিপোর্ট করে আগের দিন ঠিক করে রাখা জীপে রুমা পৌঁছে গেলাম। সেখানে পুনরায় আর্মি ক্যাম্পে রিপোর্ট করতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল মাসুদ ভাইদের সঙ্গে। তাঁরা পুকুরপাড়া-রাইক্ষ্যাং আর ডুমলং পাহাড় যাচ্ছেন। মনের ভিতর তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয়ার ঈষৎ একটা ইচ্ছা জাগতেই আবার নিভিয়ে দিলাম। বান্দারবানে একবার এসে কখনো সাধ মেটে না। আরও বহুবার আসতে হবে ভালোবাসার এই পাহাড়ের মাঝে। প্রতিবার ভিন্নরকম অভিজ্ঞতা সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

কিভাবে যাবেনঃ

ঢাকা থেকে ইউনিক, শ্যামলীসহ আরও অনেক বাস সরাসরি বান্দারবান যায়। বান্দারবান থেকে চাঁদের গাড়ি বা বাসে করে রুমা বাজার পৌঁছে সেখান থেকে পুনরায় জীপে করে বা ঝিরি পথ দিয়ে হেঁটে বগালেক পৌঁছে যেতে পারেন। বাকি পথটুকু হেঁটেই যেতে হবে। থাকা এবং খাওয়া মিলে যেকোনো পাড়ায় জনপ্রতি ২০০ টাকা করে। কিছু কিছু পাড়ায় খুশি হয়ে আপনি যা দেবেন, তাই নেবে। কিন্তু তাই বলে ওদেরকে অসম্মান করবেন না, ন্যায্য মূল্য দেবেন। পলিথিন বা পরিবেশের ক্ষতি করে এমন যেকোনো জিনিস সঙ্গে করে আনবেন না। সম্ভব হলে বেশি করে চকলেট নিয়ে যাবেন, আদিবাসী বাচ্চারা খুব পছন্দ করে, এতে ওদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা ভালো হয়ে যাবে। অবশ্যই খুচরো টাকা নিয়ে যাবেন, সম্ভব হলে নতুন টাকার নোট। চার-পাঁচজনের দল হলে জনপ্রতি ৫০০০ টাকার মধ্যে ঘুরে আসা সম্ভব। দল আরও বড় হলে খরচ আরও কমে যাবে।

এ.এস.এম. জিয়াউল হক-এর স্বপ্ন পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখার। পাশাপাশি ভালোবাসেন বিভিন্ন ধরনের মানুষের জীবনধারণ দেখার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে।

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

শীতে গড়পঞ্চকোট

সঞ্চিতা হোড়

~ গড়পঞ্চকোটের আরও ছবি ~

শীত আসছে আসছে, কর্মক্ষেত্র নামক কুরুক্ষেত্রে পোস্টলাঞ্চের সাপ্তাহান্তিক আড্ডার টপিক হতেই পারে "চলো পালাই"। পালানোর বা পাগলামির দিনক্ষণ ঠিক করে আসছে শীতে যাওয়াই যেতে পারে "গড়পঞ্চকোট"।
হ্যাঁ, ঠিক এই সময়ে গেছিলাম দুদিনের ছুটি কাটাতে, খুব কাছেই।
গিয়ে পেয়েছিলাম ইতিহাস আর অরণ্যের এক অদ্ভুত মেলবন্ধনের রূপ। আমি জানি প্রকৃতি এই বঙ্গে অকৃপণ কিন্তু ইতিহাস কি কোনো অংশে কম!

সেই ইতিহাসের সাক্ষীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। খুব ভুল যদি না করি, সময়টা ১৭৪০ সালের এপ্রিল মাস। বৈশাখের দহনে প্রকৃতি ঠিক কতটা জ্বলেছিল জানিনা। তবে আমাদের গ্রামবাংলা পুড়েছিল অন্য আগুনে। যুদ্ধের আগুন, বর্গীদের আগুন। আলীবর্দি খাঁ-র সেনাবাহিনীর কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন বাংলার তৎকালীন নবাব সরফিরাজ খাঁ। রুস্তম জঙ্গ, সরফিরাজের জামাতা, উড়িষ্যার নবাব নাজিম একটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তা যখন সাফল্যের মুখ দেখল না, তখন তিনি আলীবর্দি খাঁকে ঠেকাতে নাগপুরের তৎকালীন মারাঠা রাঘোজি ভোঁসলের কাছে সাহায্য চাইলেন। বোধহয় তখন ভাবতে পারেননি এতে কী হতে পারে! আজকের পাঞ্চেত বাঁধ যেখানে, সেই অঞ্চল দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে মারাঠা সৈন্যরা দলে দলে বাংলায় প্রবেশ করল আর প্রায় দশ বছর ধরে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বাংলায় শোষণ আর লুঠপাঠ চালিয়ে গেল। বর্গী অর্থাৎ মারাঠা সৈন্যদের অত্যাচার এক কলঙ্কময় অধ্যায় হয়ে দেখা দিল সোনার বাংলায়। শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ সালে মারাঠা রাজা ও তৎকালীন বাংলার নবাবের সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হওয়ায় এর অবসান ঘটে। এরই মাঝে কোনও এক সময় বর্গীদের আক্রমণে গড়পঞ্চকোটের পতন ঘটে। আবহমান কালের প্রবাহস্রোতে আর আমাদের অবহেলা ও অযত্নে যা এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত। তবু আজও, এখনও যা অক্ষুণ্ণ আছে তাও ফেলনা নয়।

১৭৫১-র প্রায় একশো বছরেরও বেশি সময় পরে যখন গড়পঞ্চকোটের প্রাসাদ, গড়, তথাকথিত স্থাপত্য প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত, তখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের যোগদান পঞ্চকোটের রাজার এস্টেট ম্যানেজার হিসেবে। কর্মসূত্রে খুব বেশি সময় এখানে উনি কাটাতে পারেননি শারীরিক

অসুস্থতার কারণে। ১৮৭২ সালে কবি মধুসূদন অল্প সময়ের জন্য সিংহদেও রাজাদের এস্টেট ম্যানেজারের কাজ করেছিলেন। তখন রাজা ছিলেন নীলমণি সিং দেও। সেই সময় মাইকেল তিনটি চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছিলেন-- 'পঞ্চকোট গিরি', 'পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী' এবং "পঞ্চকোট গিরি বিদায় সঙ্গীত"।
শোনা যায় পুরুলিয়ার একজন খ্রিস্টান কালিচরণ সিংহের পুত্রসন্তানের খ্রিস্টধর্ম নেওয়ার সময় মধুসূদন ছিলেন তার ধর্মপিতা। তিনি চেষ্টা করেছিলেন প্রাচীন ইতিহাসের রক্ষণাবেক্ষণ করার কিন্তু শারীরিক কারণে সেটা সম্ভব হয়নি।
ইতিহাসের গবেষকদের মতে এই গড়পঞ্চকোটেই তিনি তার জীবনের শেষ চাকুরি করেন। কলকাতাতে ১৮৭৩ সালের ২৩শে জুন মধুসূদন দত্তের জীবনাবসান হয়।

"কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যার স্বর্ণ-জ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়াগি তোমায়
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে! এ স্থলে,
মনোদুঃখে মৌন ভাব তোমার; কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।"

গড় শব্দের অর্থ দুর্গ, পরিখা। রাজবাড়ির চারপাশে খাল কেটে রাখা হতো যাতে শত্রুরা সহজে প্রবেশ করতে না পারে। দাঁড়িয়ে আছি সেই খন্ডহরের সামনে।
লোকমুখে শোনা যায়, ৯০ খ্রিস্টাব্দে দামোদর শেখর নামে এক রাজপুত রাজা এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ৯৪০ খ্রিস্টাব্দে এই রাজধানী গড়পঞ্চকোটে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। একসময় প্রাচীন তেলকূপী রাজ্যের অংশ ছিলো এই গড়পঞ্চকোট। পঞ্চকোটের রাজারা "সিংহদেও" পদবি ব্যবহার করতেন। ওখানে একটি বাচ্চা ছেলে আমাকে ওদের বাংলা বাচনভঙ্গিতে যেভাবে সিংহদেও বলল সেটা শুনতে বেশ ভালো লাগলো। প্রাচীন ইতিহাসের ভগ্নরূপ আমাদের যন্ত্রণা দিলেও সে যেন সাক্ষী জীবনের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের। ১৬০০ সালে পঞ্চকোটের রাজা বিষ্ণুপুরের হাম্বীর মল্লের অধীনস্থ ছিলেন, তার প্রমাণস্বরূপ ১৮৬২ সালে এখানে হাম্বীর মল্লের নাম খোদাই করা দুটি শিলালেখ আবিষ্কার করেন জন বেগলার সাহেব। ১৭৫০ সাল পর্যন্ত অন্তত ৮০০ বছর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে রাজত্ব করেছিলেন পঞ্চকোটের রাজারা।
মারাঠা বর্গীরা দশ বছর ধরে বাংলায় লুঠপাঠ ও অগ্নিসংযোগ করে সোনার বাংলাকে ছারখার করে দিয়েছিল। এই বর্গীরা গড়পঞ্চকোটের রাজবাড়ি আক্রমণ করে। রাজা তাদের ঠেকাতে পারেননি। বর্গীরা রাজপ্রাসাদে লুঠপাট করে। সেই সময় রাজার সতেরো জন রানি আত্মহত্যা করেন। পরাজিত রাজা মনের দুঃখে এখান থেকে সরে গিয়ে কাশীপুরে নতুন প্রাসাদ তৈরি করেন।

ওই তো কোনো মা যেন তার কোলের সন্তানকে সেই পরিচিত গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন -

"খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।"

সূর্য পাটে বসতে চলেছে। আকাশের আলো হালকা লালচে। গাছের মাথাগুলো বেশ কালো দেখালেও একটা নরম আলো আছে। দীপেশ এবার সিগারেট ধরাল। দিল। চারপাশে পাতলা অন্ধকার। ওই পাহাড়ের ওপর উঠতে গেলে যে ফুসফুসের জোর লাগে তা বেশ মালুম পড়ে। তখন মনে হয় বুদ্ধির গোড়ায় যত কম ধোঁয়া দিয়ে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

কাশীপুর রাজবাড়ি গড়পঞ্চকোট থেকে আনুমানিক ৫০ কিমি দূরে। আর রাজবাড়ির কাছেই আছে কপিস্ত গার্ডেন। অনেক সময় ঝিলের পারে কুমিরের রোদ পোহানো দেখতে পাওয়া যায় শুনলাম, যদিও অন্ধকার নেমে আসাতে কোন ছবি তুলতে পারিনি।
এখানকার দরবেশ আপনার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে আছে। মধুমেহ-এর দৃষ্টি আপনার ওপর পড়ুক আর না পড়ুক একবার দরবেশের স্নেহের পরশ জিভে না নিলে তাকে যে বড় দুঃখ দেওয়া হবে!
এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় স্টেশন আদ্রা তৈরি হয় ১৯০৩ সালে। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এই স্টেশনটি তৈরি করেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে এখনো মাঝে মাঝে স্টিম ইঞ্জিনের দুর্লভ দর্শন পাওয়া যায়। মাত্র তিন কিলোমিটার দূরেই একটি বড় ঝিল আছে।

সবই তো হল, কিন্তু থাকব কোথায়? উন্মুক্ত প্রকৃতি ভাল, তবে নিরাপদ তো নয়! আমাদের জন্য আছে পাঞ্চেত রেসিডেন্সি।
পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন দপ্তরের গড়পঞ্চকোট বনবাংলো। শাল, তমাল, সোনাঝুরি, পলাশের সঙ্গে নানাধরনের নামী অনামী ফুলের গন্ধ, জঙ্গলের গন্ধ পেতে চাইলে থাকা যেতেই পারে এই বাংলোতে। দামোদর নদীর থেকে বয়ে আসা কুলকুল হাওয়া আর অরণ্যের সঙ্গে ইতিহাসের অন্যতম সাক্ষীর সঙ্গে কি কিছুটা সময় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায় না!

জায়গাটা এমন কিছু দূরে নয়। আসানসোল- বরাকর পেরিয়ে কুমারডুবি। সেখান থেকে গাড়িতে মিনিট চল্লিশের পথ। কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গলে ঘেরা বনবাংলো আপনাকে স্বাগত জানাবে। অনতিদূরে আপনার দিকে রক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আপনাকে ভরসা দিচ্ছে পাঞ্চেত পাহাড়। বাংলোয় ডরমিটরি থেকে শুরু করে এসি রুম পর্যন্ত আছে। চারিদিকে যে দূষণমুক্ত প্রকৃতির মাঝে পৌঁছানো গেল মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি কাটাতে, সেই বাংলোর নামেও প্রকৃতি জুড়ে রেখেছেন পশ্চিমবঙ্গের সরকার। প্রতিটা ঘরের নাম রাখা হয়েছে গাছের নামে। শাল, পিয়াল আর মহুয়ার সঙ্গে মেতে উঠেছে মন, শরীর।

"ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।"

কবির ভাষাতে মনে মনে এটাই বলতে বলতে ফেরার সময় ভাবছিলাম ভাঙা গড় কি আমরা সত্যি রক্ষা করতে পারব! পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কি আকর্ষণীয় হবে এই ইতিহাস!! কে রক্ষিবে এই দ্বার অতি যত্নে, ভালোবাসা দিয়ে!

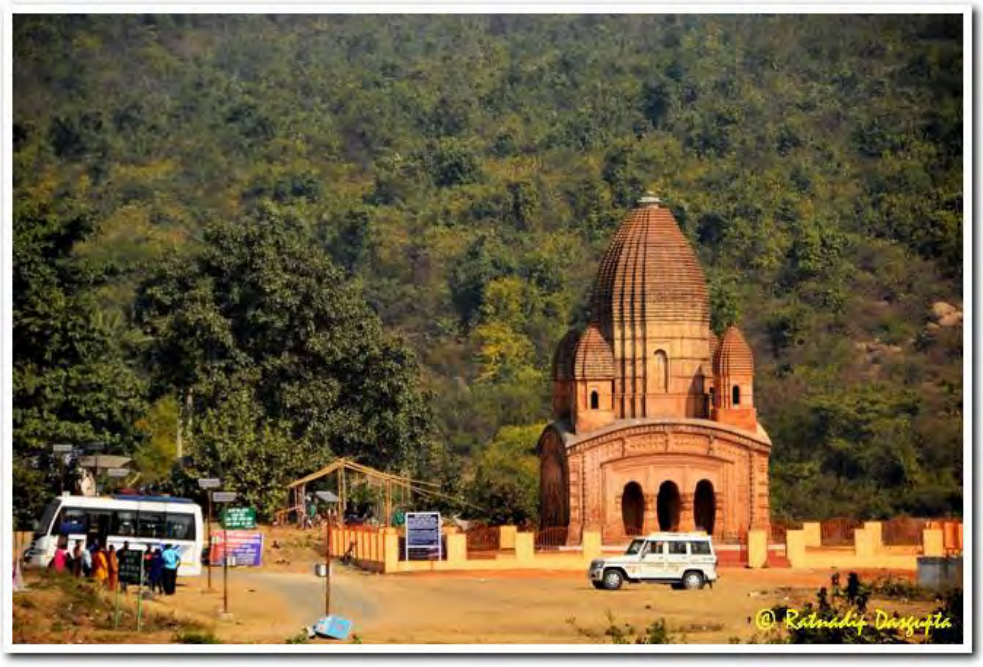

গড়পঞ্চকোট ঘিরে ঘুরতে পারেন, অযোধ্যা, জয়চন্ডী পাহাড়। এই জয়চন্ডী পাহাড়েই শ্যুটিং হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'হীরক রাজার দেশে'র। হোটেল থেকেই গাড়ি পেয়ে যাবেন। ভাড়া ১৬০০-২০০০ টাকা।

কিভাবে যাবেন - হাওড়া থেকে আদ্রা চক্রধরপুর, জনশতাব্দী, কোলফিল্ড ইত্যাদি ট্রেন। আসানসোল নেমে গাড়িতে মিনিট চল্লিশ।

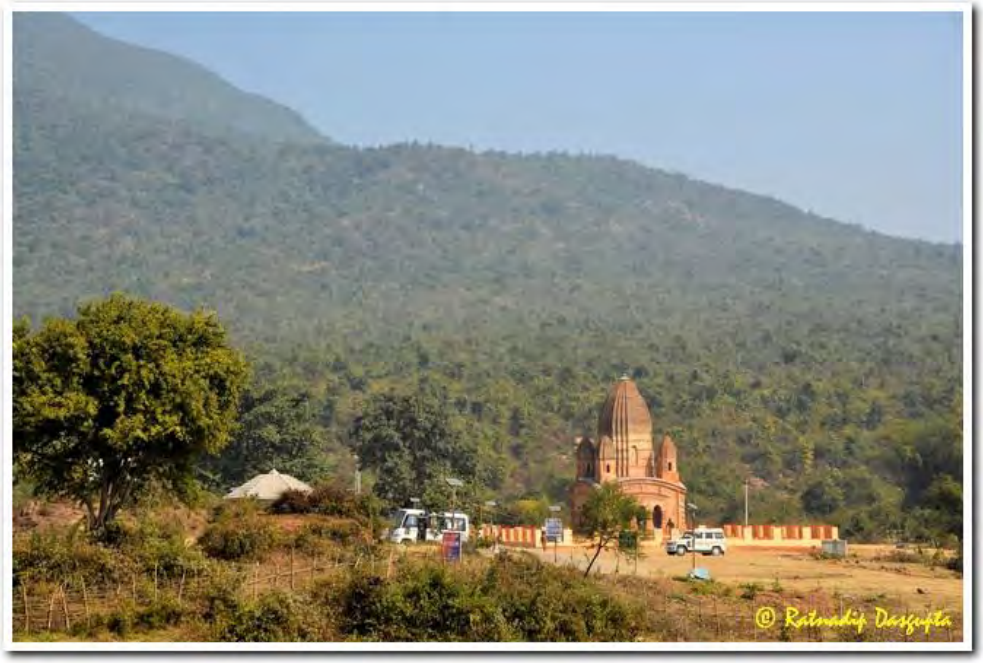

~ গড়পঞ্চকোটের আরও ছবি ~

বেসরকারি কোম্পানির হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টে চাকুরিরতা সঞ্চিতা হোড় চাকরি থেকে সামান্য সুযোগ পেলেই বেড়িয়ে পড়েন প্রকৃতির কোলে একটু ভালবাসা পাওয়ার তাগিদে। কখনো একাকী, কখনো সাথীর সঙ্গে। আর এক সঙ্গী ক্যামেরা। পাহাড় হোক কিম্বা সমুদ্র, জঙ্গল অথবা গ্রাম যেখানেই সুযোগ আসে বেড়িয়ে পড়েন। ভালবাসেন সেই জায়গার মানুষজনের সঙ্গে মিশতে, লোকসংস্কৃতিকে জানতে আর স্থানীয় খাবার চেখে দেখতে।

দুচাকায় গুরুদোংমার

গৌতম দে

নতুন মোটরবাইক কেনার পর যে অন্যরকম একটা স্পোর্টস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাব সেটা কখনোই ভাবতে পারিনি। বাইকিং এখন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয়। আমাদের একটা ছোট্ট দল আছে। তাদের সঙ্গে দুজায়গায় বাইকে ঘুরে আসার পর স্পোর্টসটা ভীষণ ভালো লেগে গেল। তাই যখন ঠিক হল পরবর্তী গন্তব্য উত্তর সিকিমের গুরুদোংমার লেক, একপায়ে রাজী হয়ে গেলাম। গুরুদোংমার লেক - উত্তর সিকিমে মোটামুটি ১৭,৮০০ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত। এতটা উচ্চতায় লেকটা বছরের বেশির ভাগ সময়ে বরফেই ঢাকা থাকে। খারাপ রাস্তা আর বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা - এই দুইয়ে মিলে লেকটাকে দুর্গম করে রেখেছে। অত্যধিক ঠাণ্ডা পরিস্থিতি আরো সঙ্গীন করে তোলে। প্রথম বাধাটা এল বাড়ি থেকে। এই বয়সে বকাবকি করা যায় না। তাই চললো সেন্টিমেন্টাল অত্যাচার। এরপর যত লোকে জেনেছে তাদের অধিকাংশই নিরুৎসাহ করেছে। সব বাধা অতিক্রম করে শুভযাত্রার দিন ঠিক হলো সাতই মে। ব্যাগপত্র বাঁধাছাঁদা সেরে শুরু হলো যাত্রা। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আমরা পাঁচজন মিলিত হলাম ডানকুনিতে। ঘড়িতে তখন রাত আড়াইটে। আধঘন্টা বাইক চালানোর পর ঘুমে চোখ খুলে রাখাটাই একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল। হাইওয়ে ড্রাইভিংয়ে সবচেয়ে বেশি বিপদ হয় এই ঘুমের জন্য। একটু থেমে চোখেমুখে জল দিয়ে নেওয়া হল। বর্ধমান যখন পৌছালাম তখন চারটে বাজে। ভোরের আলো সবে ফুটবে। সামান্য চা-পান, তারপর আবার ক্লাচ-গিয়ার। এবার ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে আমরা স্টেট হাইওয়ে ধরলাম। সুন্দর পিচঢালা রাস্তা, তার দুপাশে ধান ক্ষেত। ভোরের সূর্য প্রথম কিরণ দিয়ে গুডমর্নিং জানাল। অসাধারণ অভিজ্ঞতা। মাঝে মাঝে সাময়িক বিশ্রাম। আবার এগিয়ে চলা। ফারাক্কা যখন পৌঁছলাম তখন বেলা এগারোটা। এখানে লম্বা একটু বিশ্রাম। প্রাতরাশ সারা হল। বেলা যত বাড়ছে গরম প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার রাস্তা, একটার পর একটা মাইলস্টোন, একটার পর একটা গ্রাম, জনপদ। আস্তে আস্তে বোরিং লাগছিল। অতএব আবার বিশ্রাম। এবার কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে নেওয়া। "Riders on the storm" শুনতে শুনতে আবার পুরোনো উৎসাহ ফিরে এল। ডান কব্জিতে ছোট্ট মোচড়, বাইক আবার ৯০কিমি স্পিডে হাওয়া কাটতে লাগল। অনেক কষ্ট সহ্য করে, অনেক খারাপ রাস্তা পেরিয়ে যখন শিলিগুড়ি ঢুকলাম তখন রাত নয়টা। শরীরের শেষ ইচ্ছাশক্তিটাও যেন নিংড়ে দিয়েছি। আজ শিলিগুড়িতে রাত্রি যাপন।

পরদিন সক্কাল-সক্কাল যাত্রা শুরু। গন্তব্য সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক। শিলিগুড়ির ভীড় ছাড়িয়ে রাস্তা যখন সেবক জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলো মনে হলো এই তো জীবন। লুকিং গ্লাসে পিছনে ফেলে আসা সবুজ জঙ্গল আর তার ফাঁকে টুকরো টুকরো নীল আকাশ। এই অভিজ্ঞতা শুধুই অনুভব করতে হবে। ভাষায় বলে বোঝানো ভারী কঠিন। কিন্তু আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় খুব মনোসংযোগ দরকার বাইক চালাতে গেলে। বারবার মনে রাখতে হচ্ছে এটা কোনো ভিডিওগেম নয়। এখানে জীবন কয়েক ইঞ্চি ভুলও শুধরানোর সুযোগ দেবে না। তাই সাবধান। গ্যাংটক পর্যন্ত রাস্তা বেশ ভালো। দুপুর বারোটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম হোটেলে। অনুমতিপত্র জোগাড় করতে যাওয়া হলো ট্যুরিজম অফিসে। বিকালে বেরোনো হল রুমটেক মনেস্ট্রি দেখতে।

পরদিন আমরা প্রবেশ করব উত্তর সিকিমে। ওদিকের রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। অনবরত ধ্বস আর বৃষ্টি রাস্তার অবস্থা বেহাল করে দিয়েছে। যাত্রাপথে বর্ণনা করার মতো কিছুই নেই। শুধুই খারাপ রাস্তা। সন্ধ্যে ছয়টা নাগাদ পৌঁছানো গেল লাচেন গ্রামে। প্রথমবার যখন এই গ্রামে গাড়িতে করে এসেছিলাম, লাচেন সুন্দর ছোট্ট ছবির মতো একটা গ্রাম ছিল। ইদানীং ভুরিভুরি হোটেল গ্রামটাকে একটা ঘিঞ্জি জনপদ করে তুলেছে। তেমন কিছুই করার নেই এখানে। দশহাজার ফিটের উপরে রাত্রে ঠাণ্ডাও বাড়ছে। কাল অনেক ভোরে আমরা শুরু করব। তাই তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়া হল।

ঘড়িতে তখন রাত দুটো। অ্যালার্মে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নিলাম। আজ সঙ্গে লাগেজ নিতে হবে না। কারণ আমাদের আবার এখানেই ফিরতে হবে। ঠিক রাত সাড়ে তিনটেতে পাঁচজন চারটে রয়্যাল এনফিল্ডে যাত্রা শুরু করলাম। রাস্তায় কোনো আলো নেই, তার ওপরে আলগা পাথরে ভর্তি। খুব সাবধানে আস্তে-আস্তে বাইক উপরে উঠতে লাগল। ঠাণ্ডায় হাত জমে যাচ্ছে। শরীরের যেখানে আবরণ নেই সেখানটায় যেন অবশ হয়ে আসছে। প্রচন্ড কষ্ট সহ্য করে যখন থাঙ্গু-তে পৌঁছলাম তখন সবে ভোরের আলো ফুটছে। দোকানে ঢুকে গরম চা খেয়ে শরীরের লীনতাপটা আবার ফিরে এল।

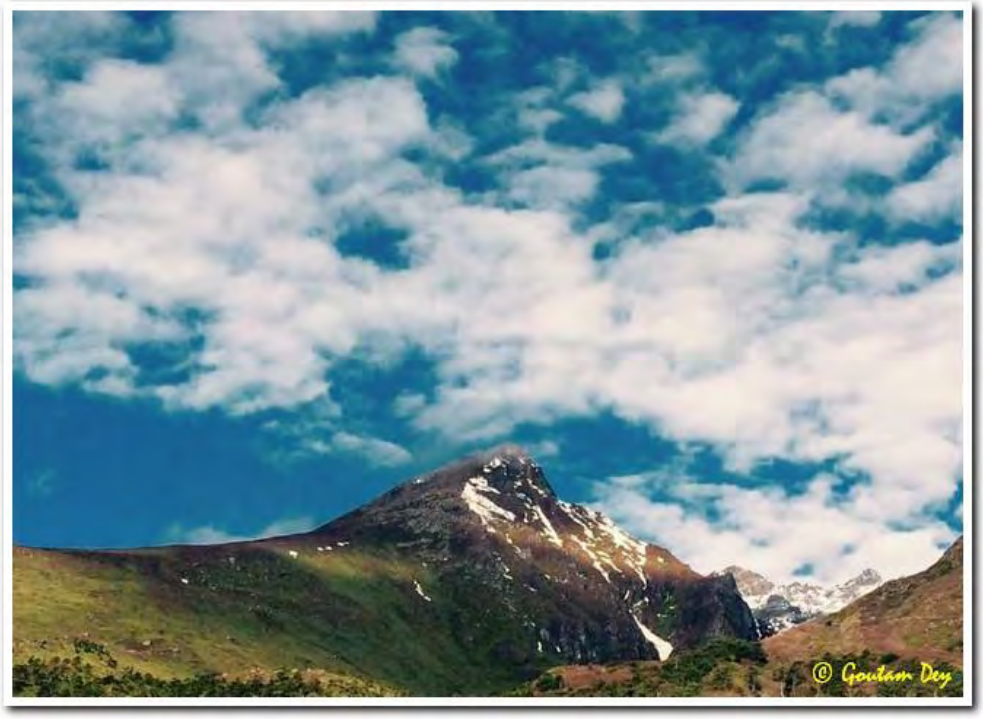

আধঘন্টা বিশ্রামের পর আবার শুরু করা গেল। এবার রাস্তা যেমন চড়াই তেমনি খারাপ। চারিদিকে স্বর্গীয় নৈসর্গিক দৃশ্য। কিন্তু মনভরে উপভোগ করতে পারছিনা। দু-চারবার নিশ্চিত পতন সামলে পৌঁছলাম গুরুদোংমার যাওয়ার পথে শেষ আর্মি চেকপোস্টে। উচ্চতা ১৫,০০০ ফিট। এখানে আর্মি পরিচালিত একটা ক্যান্টিন আছে। নামটা বেশ সুন্দর। "Cafe 15000 ft"। হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজনের বেশ শরীর খারাপ শুরু হল। এই শরীর খারাপের লক্ষণ এখানে খুব স্বাভাবিক। এতটা উচ্চতা আর বাতাসে অক্সিজেন-এর পরিমাণ এতই কম, যে শরীরের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন। কোনোরকমে তাকে সুস্থ করে, উৎসাহ দিয়ে আবার আমরা যাত্রা শুরু করলাম।

এখন ভৌগোলিক পরিবেশ পুরো বদলে গেছে। চারিদিকে শুধু মরুভূমির মতো পাহাড়। গাছপালার কোনো চিহ্ন নেই। তার মাঝখান দিয়ে সুন্দর পিচঢালা রাস্তা। এই মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে ১৪ কিমি যাওয়ার পর আমাদের ডান দিকের পাহাড়ে উঠতে হবে। সোজা রাস্তাটা চলে গেছে চোলামু লেক-এর দিকে যেখানে সাধারণ নাগরিকের প্রবেশ নিষেধ। পাহাড়ের ঢালে আবার খারাপ রাস্তা। তার মাঝে প্রচন্ড ঠাণ্ডা আর অক্সিজেনের অভাবে বাইক বারবার ইস্তফা দিচ্ছে। এরকম অবস্থায় অনেক চেষ্টা করেও নিজের পড়ে যাওয়াটা আটকাতে পারলাম না। তবে আমি ভাগ্যবান যে এখানে কোনো খাদ নেই আর আমার পায়ে গার্ড পড়া ছিল। যাই হোক, অবশেষে ধুঁকতে ধুঁকতে পৌঁছালাম লেকের ধারে। যাকে দেখতে এতদূর আসা সেই পবিত্র লেকের শোভা অপূর্ব। সত্যি মনে হচ্ছিল যে কিছু একটা অর্জন করেছি। দুই হাত আকাশের দিকে তুলে একটু সেলিব্রেশন হলো। মনে হলো ল্যাদখাওয়া বাঙালিও পারে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে সাফল্য পেতে। লেকের ধারে নেমে জল মাথায় ছুঁয়ে কিছুটা পাপস্খলন করা গেল।

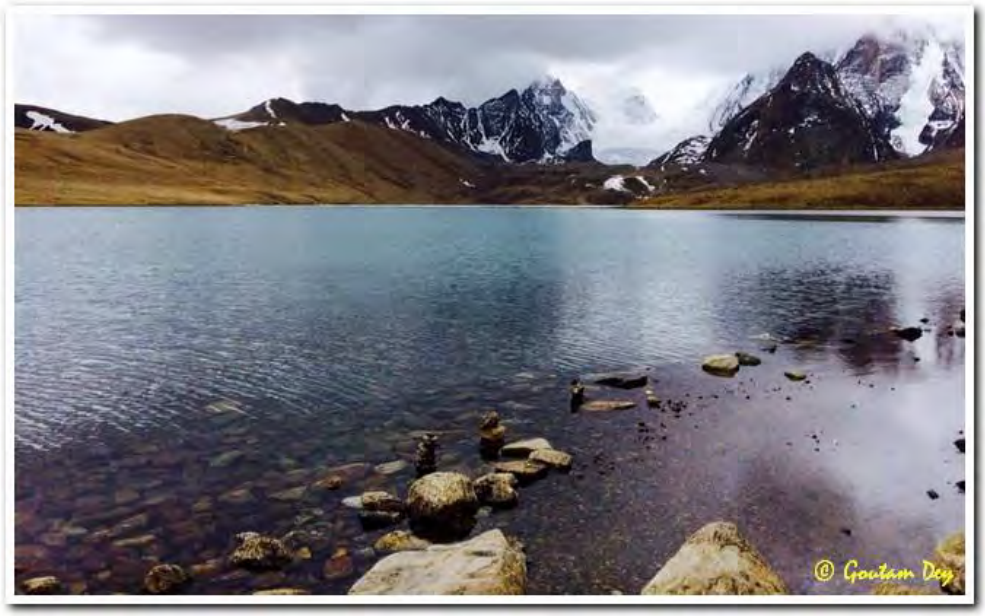

ফেরার পথে শুরু হলো তুষারপাত। চারিদিক দশ মিনিটের মধ্যে সাদা হয়ে গেল। এরমাঝে বাইক চালানো যেন অসম্ভব হয়ে উঠলো। কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। তার উপর ঠাণ্ডাও বেড়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে। কোথাও যে দাঁড়াব তারও উপায় নেই। কোনোরকমে পৌঁছালাম থাঙ্গুতে। ততক্ষণে তুষারপাত থেমেছে। তারপর ধীরেধীরে নেমে চলা লাচেনের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে থাকলো এমন এক স্মৃতি যা নিয়ে হয়ত গর্ব করা চলে।

নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি প্রফেশনাল গৌতম দে বর্তমানে লিনডে-তে কর্মরত। স্বল্পপরিচিত জায়গায় ঘুরে বেড়ানোটাই নেশা। ভালোবাসেন ট্রেক করতে ও মোটরবাইক চালিয়ে ঘুরে বেড়াতে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বারাণসী ও এলাহাবাদ

তপন পাল

~ বারাণসীর আরও ছবি ~

প্রস্তাবনা।।
বারাণসী। গঙ্গার পশ্চিমতীরে বরুণা ও অসি নদীর মধ্যবর্তী বারাণসী শহরটি শুনেছি বিশ্বের প্রাচীনতম জীবন্ত শহর; অর্থাৎ একনাগাড়ে এত শতাব্দী ধরে মনুষ্য বসবাসের নজির পৃথিবীর আর কোন শহরের নেই। বারাণসী শহর পত্তন করেছিলেন নাকি সুহোত্রের পুত্র কাস্য। তাই বারাণসীর অপর নাম কাশী। মতান্তরে, শিব এই শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ পরবর্তীকালে পাণ্ডবভ্রাতারা ভ্রাতৃহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে উদ্ধার পেতে শিবের খোঁজ করতে এই শহরে এসেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, যে সাতটি শহর মোক্ষ প্রদান করতে পারে, সেগুলির একটি হল বারাণসী (হে সহৃদয় পাঠক, দয়া করে অন্য ছটি শহরের নাম জিজ্ঞাসা করবেন না; জানি না)।

৫২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বারাণসীর কাছে সারনাথে মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ তাঁর প্রথম দেশনা, 'ধর্মচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্র' প্রবর্তন করেন। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফা হিয়েন ও খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং বারাণসীতে এসেছিলেন। ১১৯৪ সালে তুর্কি মুসলমান শাসক কুতুবুদ্দিন আইবক বারাণসী জয় করে শহরের প্রায় এক হাজার মন্দির ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছিলেন। ১৩৭৬ সালে ফিরোজ শাহ বারাণসী অঞ্চলের কিছু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছিলেন। ১৪৯৬ সালে আফগান শাসন সিকন্দর লোদি অবশিষ্ট মন্দিরগুলির অধিকাংশই ধ্বংস করে দেন। কবীর ও রবিদাস বারাণসীতেই জন্মেছিলেন। ১৫০৭ সালের শিবরাত্রি উৎসবের সময় গুরু নানক এই শহরে আসেন। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবর এই শহরে শিব ও বিষ্ণুর দুটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। পুণের রাজা প্রতিষ্ঠা করেন অন্নপূর্ণা মন্দির; ১৬৬৫ সালে আসেন ফরাসি পর্যটক জ্যঁ ব্যপ্তিস্ত তাভার্নিয়ার।

ভারতে জন্মানো প্রথম নোবেল বিজেতা বারাণসী শহরটিকে বর্ণনা করেছেন 'দু হাজার মন্দির, আর দুই দুগুণে চার হাজার দুর্গন্ধ' ('of Two Thousand Temples, and twice two thousand stenches')। বেনারস নামের উৎসসন্ধান করতে গিয়ে কিপলিং লিখেছেন বে, উর্দু শব্দ, মানে বিনা, ব্যতীত; আর নারেস ল্যাটিন শব্দ, অর্থ নাসিকাগহ্বর। অর্থাৎ বেনারসে ঢুকতে হলে নাসিকাটিকে ছুটি দিয়েই ঢুকতে হবে। ১৯১৫তে গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের অনুরোধে ভারতে ফিরে বাপুজির প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা এই বারাণসীতেই, ১৯১৬য়। সেখানে তিনি শহরের বাসিন্দাদের দস্তুরমত ভর্ৎসনা করেন শহরটিকে নোংরা করে রাখার জন্য। তাঁর আত্মজীবনীতেও তিনি বারাণসীর তীর্থযাত্রী আর দোকানদারদের উচ্চকিত কোলাহল আর মাছির পালকে মনে করেছেন 'অসহ্য'। সময় বদলায়, কাশী বদলায় না, এই সেদিনেও (নভেম্বর ২০১৮) বারাণসীতে নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে দুজন সাফাইকর্মী মারা গেলেন।
তবে এইসব পড়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শুধু হোমড়াচোমড়ারাই তো আর কাশী যায় না, হরিপদ কেরানি, ক্যাপাতুল্লা শেখেরাও যায়। আর আমার মত কিছু লোক, ধর্মভীরু না হয়েও, প্রতি বছরই যায়।

প্রথম দিন।।
সাবেক কালে বাঙালি কাশী যেত আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে। হরিহর অপু সর্বজয়াকে নিয়ে এই রেলগাড়িতেই কাশী গিয়েছিলেন, সর্বজয়া অপুকে নিয়ে এই রেলগাড়িতেই কাশী থেকে ফিরেছিলেন; এমনকি আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের যে মায়েরা পুত্র অসবর্ণ বিবাহ করছে জানতে পারলেই 'বাবা তুই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে' বলে কাঁদতে বসতেন, তাঁরাও এই রেলগাড়িতেই কাশী যেতেন। বিগত তিন শতক ধরে যে বাঙালি মহিলারা, বিশেষত বিধবা মহিলারা কাশী যেতেন তাদের অধিকাংশই অনন্যোপায় হয়ে যেতেন না ফেরার পথে। 'অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিতেই বিনোদিনী কহিল, "মা, আমাকে তোমার পায়ে স্থান দিতে হইবে। পাপিষ্ঠা বলিয়া আমাকে তুমি ঠেলিয়ো না।" অন্নপূর্ণা কহিলেন, "মা, চলো, আমার সঙ্গেই চলো।" তাই ফেরার পথে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস অনেকখানি ফাঁকা থাকত।
শ্যালদা থেকে রাতের বেলা ট্রেন; বাঙালি ট্রেনে উঠত পরোটা আলুচচ্চড়ি বেঁধে। দক্ষিণেশ্বরে একবার পেন্নাম ঠুকেই পরোটা

আলুচচ্চড়ির সদগতি, তারপর ঘুম। ভোর হত বারহাড়োয়ায় পানিপাঁড়ের ডাকে। তারপর জানা অজানা অনেক স্টেশনে থামতে থামতে সকরিগলি, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর, কিউল, মোকামা, বক্তিয়ারপুর পেরিয়ে রাতের বেলা কাশী – যেতে পুরো এক দিন। তাতে বাঙালির কোন আপত্তি ছিল না, কারণ সে জানত তীর্থক্ষেত্র পথের শেষে নয়, পথের দুধারেই; তীর্থযাত্রা কথাটির মধ্যেই নিহিত আছে যাত্রার অনুষঙ্গ।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় মানসিকতা। আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস আজও ছাড়ে; যাত্রাপথ খণ্ডিত হয়ে, নাম বদলে সে এখন ১৩১৩৩ শিয়ালদহ বারাণসী এক্সপ্রেস; শিয়ালদহ ছাড়ে রাত সোয়া নটায়, বারাণসী পৌঁছায় পরদিন রাত নটা চল্লিশে। তেরোটি মাত্র কামরা নিয়ে আশিটি বিরতি দিয়ে ৮৭২ কিলোমিটার যেতে সে সময় নেয় চব্বিশ ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট; গড় গতিবেগ ৩৬ কিলোমিটার/ঘণ্টা। তবে নেহাত দায়ে না পড়লে ওই গাড়িতে কেউ চড়ে না। লোকের পছন্দ অপেক্ষাকৃত দ্রুতগামী রাতের রেলগাড়িগুলি, যথা দুন এক্সপ্রেস বা অমৃতসর মেল, বিভূতি এক্সপ্রেস বা হিমগিরি এক্সপ্রেস। তবে আমার পছন্দ দিনের রেলগাড়ি, বার্থে ঠ্যাং ছড়িয়ে মোটা কাচের মধ্য দিয়ে চেয়ে থাকবো জানালা ছাড়িয়ে দূরে, দেখবো গাছ, নদী, পাহাড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুল গমন ও প্রত্যাবর্তন - এবং মানুষের অর্বাচীন সভ্যতা। ১২৩৮১ পূর্বা এক্সপ্রেস হাওড়া ছাড়ে রবি, বুধ আর বেস্পতিবারে, সকাল সোয়া আটটায়, বাইশটি LHB কামরা নিয়ে ৬১২০ অশ্বশক্তির WAP 7 লোকোর পিছনে গ্র্যান্ড কর্ড হয়ে, ধানবাদ, কোডারমা গয়া দেহরি অন শোন হয়ে, বরাকর কাত্রি জামুনিয়া দামোদর ধাধর ফল্গু পুনপুন শোন দুর্গতি কর্মনাশা এবং পরিশেষে গঙ্গা পেরিয়ে বারাণসী পৌঁছায় বিকেল পৌনে সাতটায়।
হাওড়া ছেড়ে মধ্যাহ্নভোজের পর কোডারমা। হাওড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ মিটার উঁচুতে, আর কোডারমা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিনশো নিরানব্বই মিটার উঁচুতে। এতটা উঁচুতে উঠে এসেছি ভাবতেই আমার শ্বাসকষ্ট শুরু হল; বাতাস এখানে বড়ই পাতলা। বার্থে লম্বা হলাম, চেয়ে চেয়ে দেখতে রইলাম ঢেউখেলানো টাঁড় জমি, প্রায়-শুকনো নদীবক্ষ, টানেল, অরণ্য, টিলা, আর অনেক দূরে দূরে বাড়িঘর। গয়া দেহরি অন শোন পেরিয়ে মুঘলসরাই। ১২৩৮১ পূর্বা এক্সপ্রেস আগে এখানে ইঞ্জিন বদলাত - বারাণসী লাইন তখন ছিল অবৈদ্যুতায়িত। এখন আর সেসব নেই, মুঘলসরাই; তারপরেই বারাণসী।

তীর্থযাত্রা, তীর্থভ্রমণ – শব্দগুলির মধ্যে নিহিত যাত্রা বা ভ্রমণের যে অনুষঙ্গ, তা আমার মনে বহুমাত্রিক; সে যতখানি না বস্তুগত, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আধ্যাত্মিক। গুরু নানক তখন জ্ঞানের সন্ধানে পূর্ব ভারতের হিন্দু তীর্থস্থানগুলিতে ভ্রমণরত। প্রথানুগ তীর্থক্ষেত্রগুলি তাঁকে টানল না – মলিন অপরাহ্নে আকাশ চিরে উড়ে চলা এক পরিযায়ী পাখির ঝাঁক তাঁকে ঈশ্বরদর্শনের আনন্দ দিল - মনে হল নদীঘাটে স্নানরত পাপস্খালনোন্মুখ লোকগুলির চেয়ে ঐ বিহঙ্গরা স্বর্গের অনেক কাছাকাছি। রৌপ্যশুভ্র পক্ষ, দীর্ঘগ্রীবা ও লোহিত অক্ষপুটের এই বিহঙ্গরা উড়ে যায় কত দূর - কত সাগর নদী জনপদ উপত্যকা পর্বতমালা পেরিয়ে – শুধু যাওয়ার জন্য, যাওয়ার আনন্দে। তীর্থযাত্রাও তেমনতর, পথচলাটাই সেখানে মুখ্য, গৌণ গন্তব্য। জিম করবেট সাহেবও তার রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতার (আসলে লেপার্ড, Panthera pardus, চিতা Acinonyx jubatus – তবে বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে আমরা চিতাই বলবো – যেমন turtle ও tortoise দুজনকেই বাংলায় কচ্ছপ বলি, antelope ও deer দুজনকেই বলি হরিণ, crocodile আর alligator দুজনেই কুমীর) আখ্যানে লিখেছেন কিভাবে সমতলবাসী তীর্থযাত্রীদের রক্তাক্ত পদচ্ছাপ পদচিহ্ন রেখে যায় গাড়োয়ালের পুণ্যভূমিতে। আমরা বয়স্কদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, সে কি তাদের পায়ে লেগে থাকা দূর দূরান্তরের তীর্থরজ মস্তকে নিয়ে তাদের অর্জিত পুণ্যের, অভিজ্ঞতার, অন্তঃকরণ প্রসারতার অংশভাক হওয়ার প্রত্যাশায়; ঠিক যেমনটি তীর্থযাত্রার কাহিনী শুনে মানুষ পুণ্যার্জনের প্রত্যাশা করে!

গলায় মুণ্ডমালা, একহাতে ময়ূরপুচ্ছের ঝাঁটা, অন্য হাতে ত্রিশূল, কুকুরবাহন কালভৈরব হলেন কাশীর কোতোয়াল। এনার নিবাস ভারনাথ, বিশ্বেশ্বরগঞ্জে। শহরটাকে আপদ-বিপদ থেকে ইনিই রক্ষা করেন। এনার অনুমতি না হলে কাশীতে কেউ রাত্রিবাস করতে পারেন না। 'কাল' – সময় ও মরণ দুই অর্থেই – এঁর কাছে পরাভূত। কাশীর সমস্ত বড় বড় মন্দির মুসলিম শাসকদের হাতে পড়ে বারবার ধ্বংস হয়েছে। ঔরঙ্গজেব তো কাশীর একটা মন্দিরকেও আস্ত রাখেননি। কিন্তু কালভৈরব মন্দিরে কদাচ কাহারও হাত পড়েনি। ইনি শিবের সহচর; মতান্তরে অন্যতর রূপ। কালভৈরব মন্দিরের পাশেই মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব মন্দির; সঙ্গে পবিত্র কূপ। ওঁদের সঙ্গে দেখা করে অনুমতি নিয়ে আমরা হোটেলে।

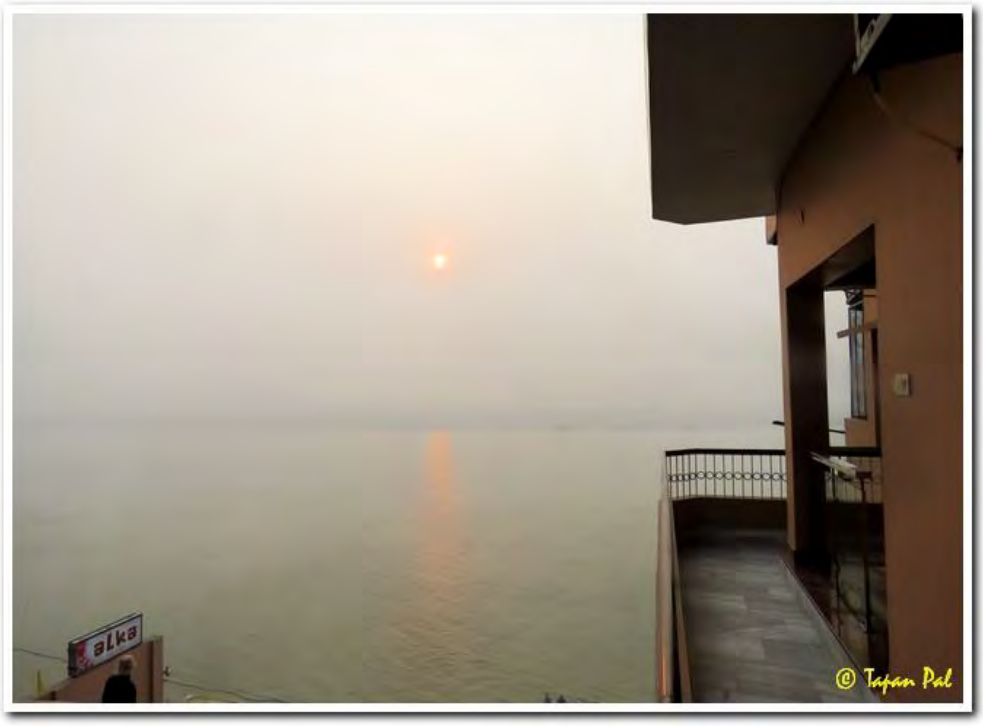

বারাণসীতে আমরা উঠি মিরঘাটের নদীতীরবর্তী এক হোটেলে; হোটেলটি অতীব মনোরম ও স্বাচ্ছন্দ্যমূলক, কিন্তু অতিশয় মহার্ঘ – এতটাই মহার্ঘ যে অবসরজীবনে পেনসনের আয়ে তথায় স্থিতি ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠছে। তার বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায় নদীর ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়া বাউন্ডুলে বাতাস, ধেয়ে আসা বৃষ্টি; কিন্তু হোটেলটিতে পৌঁছতে হলে রিকশা বা অটো থেকে নেমে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা গলি দিয়ে গোবর মাড়িয়ে, বিশ্বনাথ মন্দিরের খিড়কি কাটিয়ে, কাশীতে সতীদেবীর তিন অক্ষির একটি যেখানে পতিত হয়েছিল বলে লোকবিশ্বাস সেই বিশালাক্ষী মন্দিরের গা ঘেঁষে, হাঁটতে হয়। সেইরকমভাবেই হোটেলে পৌঁছানো গেল। 'কেবল পেটে বড় ভুখ, না খেলে নাই কোন সুখ। আয়রে তবে খাওয়া যাক, মন্ডা মিঠাই চাওয়া যাক।' তবে কাশীতে গঙ্গাতীরে আমিষভক্ষণ নিষিদ্ধ বলে 'কোর্মা কালিয়া পোলাও, জলদি লাও, জলদি লাও' উহ্য রইল।

দ্বিতীয় দিন।।
'ত আলল্লা বনারস চশমে বদ দুর/ বহিশতে খুর্রমো ফিরদৌসে মামুর /ইবাতত খান নাকুসিয়াঁ অস্ত/ হমানা কাবয়ে হিন্দোস্তাঁ অস্ত' গালিবদাদার এই লাইন কটির সারাৎসার 'হে ঈশ্বর, আনন্দময় স্বর্গ বেনারসকে তুমি অশুভ দৃষ্টি থেকে দূরে রেখো। ঘণ্টাবাদকদের (হিন্দুদের) এই উপাসনাস্থল হিন্দুস্তানের কাবা'।

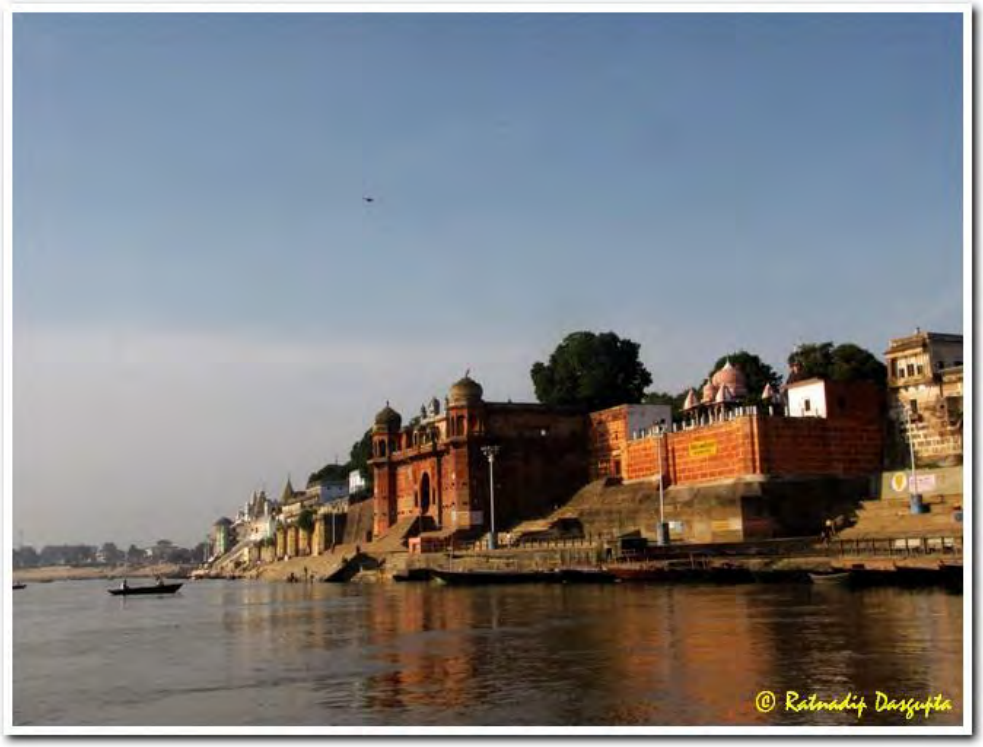

পরদিন ভোর না হতেই নৌকাবিহারে। গাঢ় কুয়াশা নদীর উপর ঝুলে রয়েছে – জিলিপির কড়াইয়ের উপর জিলিপির মত। হোটেলের ঘাট থেকেই নৌকা ধরে অনেকখানি গিয়ে অসি ঘাট, সেখান থেকে যাত্রা শুরু হল। একদা, যখন চাকরি করতাম, পুরী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের উপর ধর্মভীরু ভারতীয় ভ্রমণার্থীদের জন্য ইংরাজিতে একটি ট্রাভেল গাইড লিখেছিলাম। প্রকাশক সত্তর হাজার টাকা চেয়ে বসাতে সেই বই আলোর মুখ দেখেনি। তাতে কি! এবারে বারাণসীর উপর ওমত একটি ট্রাভেল গাইড লিখব বলে আদাজল খেয়ে লেগেছি। তার জন্য ঘাটগুলি খুঁটিয়ে দেখা বড় দরকার ছিল। অসি থেকে বরুণা, এর মধ্যে উত্তরবাহিনী গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বিরাশিটি ঘাট, প্রতিটি ঘাটের উপরে তিন চারটি করে মন্দির, কোথাও কোথাও আরও বেশি; এবং ঘাটের নিকটবর্তী মন্দিরের সংখ্যাও কম নয়। এর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দরকার ছিল।
প্রসঙ্গত কোলকাতায় খ্যাত অখ্যাত মিলিয়ে ঘাট নাকি ঊনষাটটা, আর বাংলার বারাণসী পণ্যহাটি বা পানিহাটিতে উনিশটা - তবে পানিহাটিতে ঘাটের সংখ্যা আমি মিলিয়ে দেখিনি। পাশাপাশি শহর কাটোয়া প্রাচীনকাল থেকে গুপ্ত বারাণসীর মর্যাদা পেয়েছিল।

অসি 'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে' – এসে গঙ্গায় পড়েছে। প্রস্থে ছোট হলে কি হয়, মাহাত্ম্যে সে বড়। বারাণসী শহরের দক্ষিণতম বিন্দু এটিই। সেখানেই অসি ঘাট। এরপর গঙ্গামহল ঘাট, রেওয়ান ঘাট, তুলসি ঘাট, ভাদাইনি ঘাট, জানকী ঘাট, আনন্দময়ী ঘাট, ভচ্চরাজা ঘাট, নিষাদ ঘাট, প্রভু ঘাট, পঞ্চকোটা ঘাট, চেতসিং ঘাট, নিরঞ্জনী ঘাট, মহানির্বাণী ঘাট, শিবলা ঘাট, গুলারিয়া ঘাট, দণ্ডি ঘাট, হনুমান ঘাট, প্রাচীন হনুমান ঘাট, কর্ণাটক ঘাট, হরিশচন্দ্র ঘাট, লালি ঘাট, বিজয়নগর ঘাট, পেরিয়ে চব্বিশতম ঘাট হচ্ছে কেদার ঘাট। এটি একটি প্রধান ঘাট।

বশিষ্ঠ নামে উজ্জয়িনীর এক ব্রাহ্মণ বারাণসী থেকে প্রতি বছর কেদারদর্শনে যেতেন। ক্রমে বয়স বাড়ে, জরা ধরে, হিমালয় দুর্গমতর হয়ে ওঠে। পরিশেষে এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, স্বয়ং কেদারনাথ তাঁকে বরপ্রদানে উদ্যত; তিনি কেদারনাথকে কাশীতে অবস্থান করতে অনুরোধ করেন। তখন হিমালয়ের কেদারনাথের এক অংশ থেকে বারাণসীর গঙ্গার ধারে স্বয়ম্ভু এক শিবলিঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেটিই কেদারেশ্বর শিব। কেদারঘাটে রয়েছে গৌরী কেদারেশ্বর মন্দির, অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে যেতে হয়; পাথরের লিঙ্গদর্শনে কেদারনাথ দর্শনের পুণ্য অর্জন করা যায় বলে গুজব। এই ঘাটটি বাঙালিদের কাছে অতীব জনপ্রিয়।

এরপর চৌকি ঘাট, সোমেশ্বর ঘাট, মানসসরোবর ঘাট, নারদ ঘাট, রাজা ঘাট, খড়ি ঘাট, পাণ্ডে ঘাট, সর্বেশ্বর ঘাট, দিগপটিয়া ঘাট, চৌষত্তি ঘাট, রাণামহল ঘাট, দ্বারভাঙা ঘাট, মুনশি ঘাট, অহল্যাবাই ঘাট, শীতলা ঘাট পেরিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাট; চল্লিশতম ঘাট এবং সম্ভবত কাশীর প্রধানতম ঘাট। মনে পড়ে 'অপু কয়দিন গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর ডাক্তারের ডিসপেন্সারি হইতে ঔষধ আনিল বিশেষ কোনো ফল দেখা গেল না। দিন দিন হরিহর দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল'। দশাশ্বমেধ ঘাটে নাকি স্বয়ং ব্রহ্মা দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, তাই এই নাম। মতান্তরে, এই ঘাটে স্নান করলে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্পন্ন করার পুণ্য অর্জিত হয়। দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপরে বিশাল বিশাল ছাতার তলায় পন্ডিতরা পুরোহিতরা জাঁকিয়ে বসে – কেউ হাত দেখছেন, কেউ ধর্মীয় আচার সম্পন্ন করছেন, কেউ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। 'পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে' – সে যেন এক মেলা। কাশীর বিখ্যাত বাঁশের ছাতা এই ঘাটেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। হাত দিয়ে দেখলাম, অসম্ভব ভারি, নচেৎ একটা বাড়ি নিয়ে গেলে হত, ছাদে লাগাতাম। এখানে সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতি হয়, আমাদের হোটেলের ঘর থেকে দেখা যায়; সে এক হইহই কাণ্ড।

তার গায়েগায়েই প্রয়াগ ঘাট, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘাট, মানমন্দির ঘাট। এখানে কাশীর 'যন্তর মন্তর'। জয়পুরের রাজার তৈরি এই ঘাটে প্রতিদিন সকালে শ্বেতবস্ত্র, মুন্ডিতমস্তক সৌম্যদর্শন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা আরাধনা করেন। এরপর ত্রিপুরাভৈরবী ঘাট, মির ঘাট। আমাদের হোটেল এই ঘাটের একদম ওপরে; হোটেল থেকে সিঁড়ি সোজা জলে নেমে এসেছে। রোজ সন্ধ্যাবেলা একজন হোটেল কর্মচারী ঘণ্টা নেড়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে গঙ্গা আরতি করেন। শ্রীমতী পাল তাকে দক্ষিণা দেন, তিনি আমাকে পেঁড়া দেন। অনেক অনেক বছর আগে যখন মেডিক্যাল কলেজে চাকরি করতাম, সেখানকার অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বনামধন্য শারীরবিদ্যার অধ্যাপক, আমার রক্তে চিনির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কম দেখে আমাকে পান্তুয়া খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ফলে 'চুলে আমার যত ধরুক পাক' – মিষ্টি পেলে ভুলতে পারি পরকালের ডাক।

মিরঘাট পেরিয়ে ফুটো বা নয়া ঘাট, নেপালি ঘাট, ললিতা ঘাট, তার উপরেই ললিতাগৌরী মন্দির। এরপর জলশায়ী ঘাট, খিড়কি ঘাট পেরিয়ে একান্নতম ঘাট, মণিকর্ণিকা। এই শ্মশানে চিতা কখনও নেভে না। আমাদের কৈশোরে এখন যাকে বলে নাইটলাইফ, তেমন কিছু ছিল না। সেই ঘাটতি আমরা পোষাতাম আত্মীয় পরিজন প্রতিবেশীদের জন্যে হাসপাতালে রাত জেগে, আর শ্মশানে মড়া পুড়িয়ে। যাবতীয় নিষিদ্ধ আমোদের সেই ছিল উৎসমুখ। তাই শ্মশান আমার খুব পছন্দের জায়গা। সেখানে আমার কোনরকম অস্বস্তি হয় না, বরং শ্মশানের মাটিতে দাঁড়ালেই আমার খিদে পায়। নৌকা ভিড়িয়ে নামলাম।

শঙ্করাচার্য একবার এই ঘাটে এসেছেন, আচমকা এক কদাকার ভীষণমূর্তি চণ্ডাল চারটি কুকুর নিয়ে এগিয়ে এল। ওরে যা যা। শঙ্করাচার্য উত্তেজিত কণ্ঠে চণ্ডালকে কুকুরগুলি সরাতে বললেন। চণ্ডাল বললেন 'কোথায় সরে যেতে বলছেন প্রভু, এক অন্নময় দেহ থেকে আরেক অন্নময় দেহে? নাকি এক চৈতন্য থেকে অন্য চৈতন্যে? কোথায় যাব? আপনি কি দেহটাকে সরে যেতে বলছেন? না আত্মাকে? আত্মা তো সর্বব্যাপী নিষ্ক্রিয় ও সতত শুদ্ধস্বভাব। আর যদি দেহটাকে সরে যেতে বলে থাকেন, দেহ তো জড়, সে কি করে সরে যাবে? আর আপনার দেহ হতে অন্য দেহ কোন অংশে ভিন্ন? অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ-চন্ডালে কি কোনো ভেদ আছে? গঙ্গাজলে প্রতিবিম্বিত সূর্য ও সুরামধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য কি পৃথক?' শঙ্করাচার্য বুঝলেন ইনিই স্বয়ং শিব। চন্ডালের বেশে কাশীর গঙ্গাতীরে তাঁকে অদ্বৈততত্ত্ব বোঝাতে এসেছেন।

বাড়ির দেওয়ালগুলোও ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে, বাতাসে পোড়া গন্ধ। জলে ভাসছে শবযাত্রীদের পরিত্যক্ত বর্জ্য। সামনেই এক দেহাতি বৃদ্ধের মড়া, সঙ্গে ছয় ছেলে। তারা এসেছেন উত্তরে লখনউ পার হয়ে সিতাপুর থেকে, সময় লেগেছে দশ ঘণ্টা। কেন গো! তোমাদের ওখানে শ্মশান নেই? জানা গেল মণিকর্ণিকায় দাহ হতে পারলে পুনর্জন্ম হবে না- এমনতর অপরীক্ষিত বিশ্বাসে প্রয়াত বৃদ্ধ মৃত্যুকালে পুত্রদের বলে গেছেন তাকে মণিকর্ণিকায় দাহ করতে। এবং উনি একা নন, একই বিশ্বাসে দূরদূরান্ত থেকে মৃতদেহ এখানে আসে দাহ হতে। কেন রে বাবা, আবার জন্মাতে এত আপত্তি কেন? আর জন্মাতে এতই যদি আপত্তি, তুই কোন আক্কেলে ছটা ছেলের জন্ম দিলি!! নিজের বেলায় আঁটিসাটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি। অ্যাঁ!! আপনার বেলায় ছ' কড়ায় গণ্ডা, পরের বেলায় তিন গণ্ডা। আর না জন্মালে কি জানতে পারতিস আকাশটা কতখানি নীল, বৃষ্টিধারাস্নাতা নীপবন কতখানি হরিদ্বর্ণ, কৈশোরের প্রেম কতটা তীব্র!! শঙ্খধবল রসগোল্লা তালু আর জিভের মধ্যে বসিয়ে চাপ দিলে মিষ্টি রস বিছিয়ে যাবে মুখগহ্বর জুড়ে, জিভের স্বাদগ্রন্থিগুলি নিষিক্ত হবে রসে, শরীর-মন জুড়ে ছড়িয়ে যাবে এক অপরূপ প্রশান্তি – শুধু এই অনুভূতিটির জন্যেই তো হাজারবার জন্মানো যেতে পারে; তাই না! এসো না, কাঁটার পথে আঁধার রাতে আবার যাত্রা করি, আঘাত খেয়ে বাঁচি না হয় আঘাত খেয়ে মরি।

বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দিয়ে মাটি খুঁড়ে গর্ত করে, ওই কাজকাম না থাকলে যা হয় আর কি, হর-গৌরীর তপস্যা শুরু করলেন। তাঁর শরীরের ঘামে গর্ত ভরে গেল। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে হর-গৌরী দর্শন দিলেন, অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে গৌরীর কানের দুল খুলে জলে পড়ে গেল। আগে থেকেই প্যাঁচ আলগা ছিল বোধহয়। সেই থেকে এই ঘাটের নাম মণিকর্ণিকা। ঘাটের উপর তারকেশ্বরের মন্দির; কাশীবাসীদের অন্তিম সময়ে তাদের কানে নাকি তারকব্রহ্ম মন্ত্র দেন এই তারকেশ্বর শিব। গঙ্গার উপরে রত্নেশ্বর মহাদেব মন্দির হেলানো, আধ-ভাঙা হয়ে জলে ভাসছে। মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের সময়ে প্রতিষ্ঠাত্রী নাকি বলেছিলেন 'মা, তোমার ঋণ শোধ করলাম' – সেই দন্ডেই মন্দিরের ওই অবস্থা।

মণিকর্ণিকার পর কুয়াশা গাঢ়তর, সূর্য অবলুপ্ত এবং নদীবক্ষ নির্জনতর। আমি ও শ্রীমতী পাল ভেসে চললাম রবিঠাকুরের নিরুদ্দেশ যাত্রার মত। বাজিরাও ঘাট, সিন্ধিয়া ঘাট, এখানেই নবগ্রহ সন্নিধানে সঙ্কটাদেবীর মন্দির; পাশের ঘাটটির নাম দেবীর নামে, সঙ্কট ঘাট, গঙ্গামহল ঘাট, ভোঁসলে ঘাট, নয়া ঘাট, গণেশ ঘাট, মেহতা ঘাট, রাম ঘাট, জাতারা ঘাট, রাজা গোয়ালিয়র ঘাট, মঙ্গলা গৌরী ঘাট, বেণীমাধব ঘাট, পঞ্চগঙ্গা ঘাট। পেশোয়াদের বংশের কেউ বালাজী বিষ্ণুর মন্দির গড়ে তুলেছিলেন পঞ্চগঙ্গা ঘাটে। তাই এই ঘাট 'বালাজী ঘাট' নামেও পরিচিত। ওস্তাদ বিসমিল্লাহ্ খাঁ সাহেব এই ঘাটে রেওয়াজ করতেন; বিন্দুমাধব মন্দির এই ঘাটের উপরে। এই মন্দির, প্রয়াগ সঙ্গমের বেণীমাধব ও রামেশ্বরমের সেতুমাধব এক ত্রিত্ব – একই ধরনের মন্দির, একই ধরনের বিগ্রহ।

তারপর দুর্গা ঘাট, ব্রহ্ম ঘাট, বুন্দি ঘাট, আদি শীতলা ঘাট, লাল ঘাট, হনুমানগড়ি ঘাট, গাই ঘাট, বদরিনারায়ণ ঘাট, ত্রিলোচন ঘাট, গোলা ঘাট, নন্দেশ্বর ঘাট, সক্কা ঘাট, তেলিয়ানালা ঘাট, নয়া ঘাট, প্রহ্লাদ ঘাট, রাজা ঘাট; তারপর সেতুর নিচে দিয়ে অনেকখানি গিয়ে আদি কেশব ঘাট – তার পরেই বরুণা; মূল বারাণসীর সীমা শেষ। অসিঘাট প্রভু বিষ্ণুর মস্তক, দশাশ্বমেধ ঘাট বক্ষ, মণিকর্ণিকা ঘাট নাভি, পঞ্চগঙ্গা ঘাট উরুদ্বয় আর আদি কেশব ঘাট পদদ্বয়। ভুলে যাবেন না যে ভগবান বিষ্ণু মর্ত্যে প্রথম নেমেছিলেন এই বারাণসীতেই; তার সেই পদচ্ছাপ আজও রক্ষিত আছে মণিকর্ণিকা ঘাট ও আদি কেশব ঘাটে।

ঘাট দেখতে দেখতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল, অপরাহ্নিক গন্তব্য বারাণসীর প্রধান মন্দিররাজি। বারাণসীতে মন্দিরের মোট সংখ্যা শুনেছি বারো হাজার। এই সংখ্যাটির প্রামাণ্যতা নিয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। তবে বারাণসীর ছটি মন্দির দেখলে (এবং পয়সা দিলে) নাকি শুনেছি বারাণসী পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়। তার মধ্যে বিশ্বেশ্বরগঞ্জের কালভৈরব মন্দির আগের দিনই দেখা হয়ে গেছে, হোটেলে আসাযাওয়ার পথে দেখা হয়ে গেছে গলির মধ্যে বিশালাক্ষী মন্দির, দেবীর ভৈরব কালভৈরব। দেবী বিশালাক্ষ্মীর চোখ দুটি সোনায় বাঁধানো, এটি একান্নপীঠের অন্যতম। দেখা হয়ে গেছে গঙ্গাও; তাহলে বাকি থাকলো বাবা কাশী বিশ্বনাথ, ধুন্দিরাজ আর দণ্ডপাণি। এই তিনটি মন্দির মোটামুটি পাশাপাশি; যখন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে যাবো তখন দেখা হবে।

প্রথম গন্তব্য অসি নদীর তীরে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের দ্বারা নির্মিত সঙ্কটমোচন হনুমানের মন্দির। এইখানেই নাকি সন্ত তুলসীদাস হনুমানের দেখা পেয়েছিলেন। প্রতি মঙ্গলবারে প্রচুর ভিড় হয়; প্রতিদিন হনুমান চালিশা ও সুন্দরকাণ্ড পাঠ হয়; মন্দির থেকে বইদুটি নিয়ে তুমি পড়তে পারো কিন্তু ফেরত দিয়ে আসতে হবে, বাইবেলের মত বিনামূল্যে এখানে বই বিলি হয় না। হিন্দু জ্যোতিষমতে হনুমান দুষ্টগ্রহ শনিকে দমন করেন। তাই অনেকে শনিগ্রহদোষ খণ্ডন করার জন্য এই মন্দিরে পূজা দেন। বিস্তৃত চত্বর, তোরণ দিয়ে ঢুকে গাছপালাঘেরা বাঁদরসঙ্কুল পথে কিছুটা হেঁটে নিচু ছাদের মন্দির। পরিবেশটি ভারি ঘরোয়া, এসেছো যখন একটু বসে যাও ভাই গোছের; অনেক লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে মন্ত্রপাঠ করছেন।

এবারে তুলসীমানস মন্দির, সন্ত তুলসীদাসের স্মৃতিতে ১৯৬৪ তে নির্মিত শিখর স্থাপত্যের রামমন্দির; দেওয়ালে রামচরিতমানসের স্তোত্র উৎকীর্ণ।

দুর্গাকুণ্ড মন্দির একটি আয়তাকার কুণ্ডকে ঘিরে নাগরা স্থাপত্যের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দির। মন্দিরের লাল রং দেবী দুর্গার প্রতীক। মন্দিরটিতে কয়েকটি বহুতল মিনার আছে। নাগপঞ্চমী উপলক্ষ্যে কুণ্ডে অনন্তনাগের

উপর শায়িত বিষ্ণুর মূর্তি পূজা করা হয়। আয়তাকার কুণ্ডটি আগে সরাসরি গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল – এখন বৃষ্টির জলই ভরসা।
দুর্গা মন্দির দুর্গা ঘাটের উপরে, বারাণসীর প্রধান মন্দিরদের অন্যতম।

আলমগির মসজিদ পঞ্চগঙ্গা ঘাটের উপরেই, সপ্তদশ শতাব্দীতে আওরঙ্গজেব কর্তৃক ইসলামিক ও ভারতীয় স্থাপত্যের যুগলবন্দীতে নির্মিত; বেণীমাধব মন্দির ভেঙে তৈরি বলে লোকে আজও একে বেণীমাধব কা দরেরা বলে। অমুসলমানদের প্রবেশ নিষেধ।
তিলভাণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির বাঙালিটোলায়। মালয়ালি ও উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যের যুগলবন্দীতে নির্মিত অতিপুরাতন এই মন্দিরটির শিবলিঙ্গ নাকি প্রতি বছরই লম্বা হচ্ছেন, 'দেখ আমি বাড়ছি মামি'।
উনবিংশ শতকের নেপালি মন্দির নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের আদলে নেপালের রাজা কর্তৃক নির্মিত।

ভারতমাতা মন্দির কাশী বিদ্যাপীঠ ক্যাম্পাসে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত বারাণসীর এক জমিদার পরিবারের সদস্য, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, ১৯২১ সালে নির্মাণ করেন কাশী বিদ্যাপীঠ। ১৯৩৬ সালে তা উদ্বোধন করেছিলেন মহাত্মা গাঁধী। মন্দিরটিরও উদ্বোধন করেছিলেন মহাত্মা গাঁধী। মন্দিরের মেঝেতে সাদা মার্বেল দিয়ে অবিভক্ত ভারতের এক বিশাল মানচিত্র। মন্দিরের পাঁচটি স্তম্ভ সৃষ্টির পাঁচ উপাদানের (অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, জল, অন্তরীক্ষ) প্রতীক।

বটুকভৈরব মন্দির গুরুবাগে, অঘোরী আর তান্ত্রিকদের আখড়া; অখণ্ড দীপ সেই কোন কাল থেকে জ্বলেই চলেছে। সেই দীপের পোড়াতেল নাকি সর্বরোগের মহৌষধ। সারাদিন ঘুরে ঘুরে পায়ে একটু ব্যথা হয়েছিল, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছিলাম; তাই দেখে ওই পোড়াতেল আমাকে নেওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি, নিয়ে যান, মালিশ করে দেখবেন, বাত ব্যথা পালাবার পথ পাবে না। প্রসঙ্গত, বটুকভৈরব শিবেরই অন্যতর, কিঞ্চিৎ অপরিশীলিত রূপ।

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ১৯১৬তে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মদনমোহন মালব্য। বর্তমানে এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও এশিয়ার বৃহত্তম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। ইন্দো-গথিক স্থাপত্যের ভবনগুলি, সঙ্গে বিস্তর খোলা জায়গা, দেখলেই ঘাসে শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই নতুন বিশ্বনাথ মন্দির, বিড়লা মন্দির নামেই সবিশেষ প্রসিদ্ধ। আসল বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রবেশাধিকার কেবলমাত্র হিন্দুদের; তাই পন্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুপ্রেরণায় বিড়লারা এই মন্দির নির্মাণ করেন। অর্ধচন্দ্রাকার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ঠিক মধ্যিখানে এই মন্দিরটি, মন্দিরের শিখর যেন আকাশ ছুঁয়েছে, আর সামনে রয়েছে পন্ডিত মদনমোহন মালব্যের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। বাবা বিশ্বনাথ থাকেন একতলায়, তার মাথার ওপরে দোতলায় থাকেন রাধাকৃষ্ণ। দোতলার বারান্দা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকটা অংশ দেখা যায়, গাছগাছালি আর পাখির ডাক। মূলমন্দিরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পঞ্চমুখী শিব, পার্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, রামসীতা, হনুমান মন্দির। কিছুটা দূরে মস্ত এক গাছের নিচে কড়ি মার মন্দির। সম্পর্কে ইনি শিবের ভগিনী। সবাই সেখানে কড়ি দিয়ে পুজা দেয়।

রামনগর দুর্গ তুলসী ঘাটের বিপরীতে গঙ্গার পূর্বকূলে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীর রাজা মুঘল স্থাপত্যের এই দুর্গটি 'চুনার' বেলেপাথরে তৈরি করান। দুর্গের বৈশিষ্ট্য অর্ধচন্দ্রাকার বারান্দা, খোলা উঠোন, আর প্যাভিলিয়নগুলি। জাদুঘরটি কাশীর রাজাদের ইতিহাস বলে। দুর্গের একটি অংশই জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে, বাকি এলাকাটি কাশীর রাজার বাসভবন। ব্যাসমন্দির রামনগরে, মহাভারতকারের স্মৃতিতে। পিলিকোঠি অঞ্চলে স্বপ্ন, মানে বেনারসি শাড়ি বোনা হয়। সর্বত্রই বেনারসী শাড়ি ছেয়ে আছে; দেখতে বেশ লাগে।

বারাণসীতে এখন হইহই করে চলছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডরের কাজ, ৬০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুণ্যার্থীদের গঙ্গার ললিতা ঘাট-জলসেন ঘাট থেকে সরাসরি কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পৌঁছে দেওয়া, এখন কিছুটা ঘুরপথে যেতে হয়৷ অন্যতর উদ্দেশ্য, যাতে দূর থেকে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দেখা যায়। এই নিয়ে বিতর্ক বিস্তর। ক্ষমতাসীনদের দাবি, করিডরের মধ্যে থাকবে নানা মন্দির, থাকবে সংগ্রহশালা; তীর্থযাত্রীরা দেখবেন কাশীর সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাস - শিব এবার গেরস্থের গ্রাস থেকে মুক্তি পাবেন। ওই পথে, এবং ব্যাপকতর অর্থে সমগ্র বারাণসীতেই বাড়তি, অনর্জিত আয়ের সন্ধানে বিগত কয়েক শতক ধরে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে মন্দির। সেই সব সরিয়ে, চওড়া রাস্তা বানাতে গিয়ে মিরঘাট মণিকর্ণিকা ঘাটের সংলগ্ন লাহোরিটোলা এলাকায় ভাঙতে হয়েছে ২৫০–৩০০–৩৫০ বছরের পুরনো কয়েকশো বসতবাড়ি। বারাণসীর পথে চলতে এবার থেকে নাকি আর পদেপদে গোবর মাড়াতে হবে না।

শুনে মনে হয় ভালোই তো! ভাল কী না সেই প্রশ্ন পরে; তবে স্বার্থে ঘা পড়লে হইহই হবেই। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের ট্রাস্টি সংস্থা এবং মন্দির লাগোয়া অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কর্তৃপক্ষ একজোট হয়ে করিডরের নির্মাণ কাজ বন্ধ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন। সংখ্যালঘুদের আশঙ্কা, করিডর হলে জ্ঞানবাপী মসজিদ বিপন্ন হবে না তো? সংখ্যাগুরুদের অভিযোগ বহিঃশত্রুদের হাত থেকে বাঁচাতে বারাণসীতে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে মন্দির তৈরি করাই রীতি; এটিই এখানকার ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতি। অথচ করিডরের নামে বারাণসীতে একাধিক শিবমন্দির ভাঙ্গা হয়েছে। যার সঙ্গেই কথা বলি, নৌকার মাঝি বা রিকশাওয়ালা, বিশ্বনাথ গলির প্যাড়াওয়ালা বা মন্দিরের পূজারী – সবার গলাতেই ক্ষোভ – সেটা যতখানি না কাশীর ঐতিহ্যের কথা ভেবে, তার চেয়ে বেশি জীবিকা হারানোর ভয়ে!!
নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বা জনস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই, তবে পরিষ্কার পথঘাট দেখতে কেউ বারাণসী যায় না; তার জন্যে সিঙ্গাপুর আছে। বারাণসী গিয়ে বরং পায়ে পিচিত করে গোবর না লাগলে মন কেমন করে, মনে হয় এবারের আসাটাই অর্থহীন হয়ে গেলো, এর চেয়ে ব্যাংকক গেলেই হতো। কাশী ঠিক যে জন্য কাশী, সেই কাশীত্বটুকুই হারিয়ে যেতে বসেছে। কোন ভেনিসবাসী কি কোনদিন বলে, নালাগুলো বুজিয়ে রাস্তা করা দরকার, বা রোমবাসী কেউ বলে ফোয়ারাগুলো বন্ধ করে দেওয়া দরকার, কোনদিন যদি ছেলেপিলে পড়ে মরে যায়! হিন্দুদের তীর্থস্থানগুলি, বিশেষত শৈব মন্দিরগুলি, বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা, ভিড় ও অপরিচ্ছন্নতার জন্য খ্যাত। তাই পেরিয়ে যার যেতে ইচ্ছা হয় সে যায়, যার ইচ্ছা হয় না সে যায় না। যে যায় না সে জানে যে খ্রিস্টানদের রবিবার না মুসলমানদের শুক্রবারের মত হিন্দুদের ধর্মস্থান গমন ও প্রার্থনা বাধ্যতামূলক নয়, কারণ ঈশ্বর যিনি মন্দিরে যান আর যিনি মন্দিরে যান না উভয়ের প্রতিই সমদর্শী। সেখানে হিন্দু ধর্মস্থানকে খ্রিস্টান ধর্মস্থানসুলভ ঝাঁ চকচকে 'লুক' দেওয়ার সহসা কী প্রয়োজন পড়ল কে জানে!!

ক্ষপাবেলায় হোটেলে, বারান্দায় মকরবাহিনী, ওপারে বালি, মনে পড়ল নারায়ণ সান্যালের রূপমঞ্জরী, হটী বিদ্যালঙ্কার এই বালি মাড়িয়েই হয়তো গিয়েছিলেন ত্রৈলঙ্গস্বামী সন্নিধানে; সালটা ছিল ১৭৭৪।

আকাশ মেঘলা… হয়তো কখন নিশুত রাতে উঠবে হাওয়া।

- ক্রমশঃ -

[~ বারাণসীর আরও ছবি ~]

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূলক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সেবিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালকে বাংলা লিখতে শিখিয়েছে 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না।'

মহাবালেশ্বর ও টাপোলা

সমীরন সেন চৌধুরী

সকাল ছটায় নিশিজাগা বাসটা যখন মুম্বাই থেকে এসে দাঁড়াল মহাবালেশ্বরে, মার্চমাসের সকালের সূর্য তখনও নিদ্রামগ্ন। শেষরাতের হিম গায়ে মেখে গুটিকয়েক ট্যাক্সিচালক স্ট্যান্ডে যাত্রী ও ভোরের প্রতীক্ষায়। হোটেলের নাম বলতেই বয়স্ক এক চালক এগিয়ে এসে হাতের মালপত্র নিয়ে এগোলেন গাড়ির দিকে।

দুদিনের পড়ে পাওয়া ছুটিতে আমরা দুজনায় এসে পড়েছি সহ্যাদ্রি পর্বতমালার এই শৈলশহরে। ৪৫০০ ফুট গড় উচ্চতায় মার্চের প্রথমে আবহাওয়া ভারী মনোরম - হাল্কা শীত, গরম নেই। চারিদিক উপত্যকায় ঘেরা মহাবালেশ্বর ব্রিটিশ রাজত্বে ছিল বম্বে প্রদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। চিরহরিৎ অরণ্যে মোড়া ছবির মত সুন্দর, ছোট্ট এই শহরটি - ঝরনা, লেক ও জলপ্রপাতে ঘেরা।

হোটেলে চেক-ইন করে উপমা, স্যান্ডউইচ ও কফি সহযোগে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়া গেল সাদিক ভাইয়ের ইন্ডিকায় সওয়ার হয়ে। এ যাত্রায় তিনিই আমাদের ট্যুরগাইড-কাম-চালক। মারাঠা টানের হিন্দিতে বললেন, "প্রথমদিন মহাবালেশ্বর ঘুরে নিন। কাল নিয়ে যাব "টাপোলা"। কাশ্মীর তো দেখেছেন, আমাদেরও আছে "মিনি কাশ্মীর"।

প্রথমেই পৌঁছলাম বীণা লেকে। ১৮৪২ সালে সাতারার মহারাজা পাহাড় ও সবুজে ঘেরা নীল জলের এই লেকটির পত্তন করেন, যা পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে, চাইলেই ভেসে পড়া যায় মনের মানুষটির সঙ্গে। পরের গন্তব্য "কেটস পয়েন্ট", এখান থেকে পাঁচ কিমি দূরে, অসাধারণ একটি ভিউপয়েন্ট। নীচে খাদের দিকে তাকালে নজরে আসে কৃষ্ণা নদীর উপর ধুম ড্যাম।

একই জায়গায় দেখে নিলাম "নিডল হোল পয়েন্ট" আর "ইকো পয়েন্ট"। প্রকৃতির খেয়ালে পাহাড়ের কোলে একটি পাথর ঠিক নিডল হোলের মতো দেখতে| আবার সবটা মিলিয়ে দেখলে ঠিক যেন হাতির শুঁড়। যেকোনো ভ্রমণ পত্রিকায় মহাবালেশ্বরের প্রচ্ছদচিত্র হিসাবে এই ছবিটিই দেখা যায়। ইকো পয়েন্টে প্রিয়জনের নাম ধরে ডাকলে পাহাড় তা প্রতিধ্বনিত করে। প্রচুর ছোটো বড় বাঁদরে ভরা জায়গাটা।

এবারে চললাম স্ট্রবেরি গার্ডেন। মহাবালেশ্বরে প্রচুর ফলে – স্ট্রবেরি, গুসবেরি আর কর্ন। থোকা থোকা লাল স্ট্রবেরিতে ভরা লতানে গাছের বাগান দেখে ঢুকে পড়লাম সংলগ্ন কাফেটিতে। অর্ডার করলাম কর্ন প্যাটি ও স্ট্রবেরি ক্রিম। নরম-গরম প্যাটি ভাঙতেই মুখে পড়ল কচি কর্নের সিদ্ধ করা,

মশলায় জারানো দানা। অপূর্ব তার সুঘ্রাণ। চামচ দিয়ে কেটে মুখে তুললাম মিষ্টি স্ট্রবেরির টুকরোয় ভরা ফ্রেশ ক্রিম আর আইসক্রিমের পরতে সাজানো ঘন পানীয়। দামও সাধ্যের মধ্যেই।

এবারে জঙ্গলের রাস্তা ধরে পাহাড় টপকে চললাম অন্য এক পাহাড়চূড়ায়। এখানে দেখলাম আর্থার সিট। প্রায় ৪৮০০ ফুট উচ্চতায় পাহাড়চূড়াকে কেটে ঠিক যেন একটি ব্যালকনি তৈরি করা হয়েছে। শেষপ্রান্তে দাঁড়ালে মনে হয় যেন শূন্যে ঝুলে আছি। চারিধারে অতলস্পর্শী খাদ। বহু নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে নীল জলের ধারা - সাবিত্রী নদী। দক্ষিণদিকের রকের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় "গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অব কলোরাডো"-র।

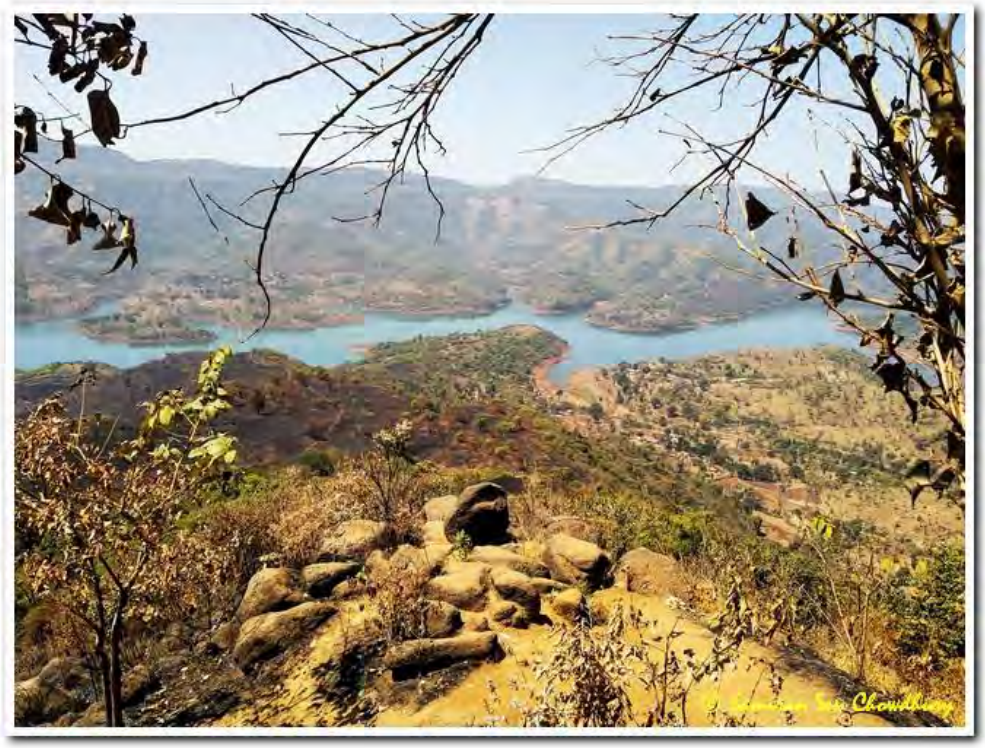

পাশাপাশি আছে ম্যালকম পয়েন্ট, টাইগার স্প্রিং, হান্টার পয়েন্ট ইত্যাদি। দেখা শেষ হলে উঠলাম গাড়িতে। এবারে শেষ দ্রষ্টব্য লডউইক পয়েন্ট, এলিফ্যান্ট হেড পয়েন্ট ও বম্বে পয়েন্ট (সানসেট পয়েন্ট)। এখানে একটু চড়াই-উৎরাই রাস্তায় হাঁটা আছে - প্রায় দুকিমি। হাঁটতে আলস্যি? কুছ পরোয়া নেই। ওই তো একজোড়া ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণা গুণে দিলেই মারাঠা সহিস হাজির হবে হাসিমুখে। বেলা কি ফুরিয়ে আসছে? একটু পা চালিয়ে চললাম। টাইগার হিলের সূর্যোদয় ও মহাবালেশ্বরের সূর্যাস্ত, কোনোটাই মিস্ করার নয়। দুজনায় চুপটি করে বসে দেখলাম শেষবেলার কমলা আলোয় চরাচর কেমন মায়াবী হয়ে উঠেছে! খুব ভাললাগার মুহূর্তগুলোয় কি একচিলতে বিষণ্ণতাও ছুঁয়ে যায়?

ফেরার পথে নেমে পড়লাম শহরের কেন্দ্রস্থলে শপিং এলাকায়। অনেকটা ম্যাল রোডের ধাঁচে এক কিমি রাস্তা জুড়ে আলো ঝলমলে, রকমারি

পশরার দোকান্। কিছু কেনার না থাকে, উইন্ডো শপিং করা যায়। ছোট বড় অসংখ্য কাফে, রেস্টুরেন্টে সেরে নেওয়া যায় নৈশাহার, তবে কেন জানি না অধিকাংশই "বিশুদ্ধ শাকাহারী"!
দ্বিতীয়দিনে সকাল সকাল চললাম সাতাশ কিমি দূরে "টাপোলা" বা "মিনি কাশ্মীর"। কী আছে দেখবার? পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, আর আছে কোয়েনা ও সলসি নদীর সঙ্গমস্থল - যা শিবসাগর লেক নামে খ্যাত। প্রায় পঞ্চাশ কিমি জুড়ে এই লেকের ব্যাপ্তি। আছে রকমারি জলক্রীড়ার আয়োজন। পথে দু বার গাড়ি দাঁড়াল। প্রথমটি শুটিং পয়েন্ট, বলিউডের বহু ছবির "লোকেশন" এই জায়গা। দ্বিতীয়টি ভিউ পয়েন্ট - এখান থেকে কোয়েনা নদীর এঁকেবেঁকে চলার যে দৃশ্য, তা মনে গেঁথে থাকে সারাজীবন।

টাপোলায় পৌঁছে দুজনায় ভেসে পড়লাম মনপবনের নাও-য়ে! নীল জলের বুকে গাঙচিলের মাছশিকার দেখতে দেখতে পার হয়ে গেলাম ছোটো ছোটো দ্বীপ। পছন্দ হলে নেমে পড়া যায় কোনো একটিতে। জলের সঙ্গে সেলফি তুলে আবার নাও ভাসানো যায়। পার হয়ে গেলাম লেকের ধারে ছবির মতো সাজানো রিসর্টগুলি। ঘন্টা দুয়েক কাটিয়ে এবার ফেরার পালা। পথে খাদের কিনারে এক নির্জন ধাবায় বসে গুজরাটি থালি দিয়ে সেরে নিলাম লাঞ্চ। ফেরার পথে দেখে নিলাম লিঙ্গমালা ওয়াটারফলস্। মার্চমাসে জলের ধারা একেবারেই ক্ষীণ, তবে বর্ষায় ভরভরন্ত। হাতে আর একটা দিন থাকলে ঘুরে আসা যেত পঞ্চগণি বা প্রতাপগড় ফোর্ট।
সন্ধ্যার আগেই শেষবারের মতো নেমে পড়লাম ম্যাল রোডে, বাড়ির জন্য কিনে নিলাম "গুসবেরি জেলি লজেন্স" আর "স্ট্রবেরি চিকি"।

পরেরদিন সকাল নটায় ফেরার বাস। মনটা ঈষৎ ভারী, এই ভিন্নস্বাদের শৈলশহরটিকে ছেড়ে যাব আজ! স্মৃতিকোঠায় রয়ে গেল কোয়েনা নদী, সূর্যাস্তের কমলা আলো আর গাংচিলের ডাক।

পেশায় বিমানকর্মী সমীরন সেন চৌধুরীর নেশা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো ও সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

গিয়ংজু : সিল্লা রাজত্বের অন্দরে

সম্পত ঘোষ

সময় প্রবহমান, কোনও বাঁধন সে মানে না, কোনও আবেগ তাকে বিচলিত করে না, আর তাই আজকের মহানগরী কালেরই নিয়মে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তার বাহ্যিক জৌলুশ হারিয়ে ফেলে ইতিহাসে পর্যবসিত হয়, সেই ইতিহাসের পাতাগুলো স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে কিনা তার বিবেচনার ভার থাকে আগামী প্রজন্মের উপরে। আমাদের গন্তব্য গিয়ংজু (Gyeongju), সিল্লা রাজত্বের (Silla dynasty, খ্রি:পূ: ৫৭ থেকে ৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ) রাজধানী এই শহর একদা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মহানগরী বলে বিবেচিত হতো। সময়ের গতিপথে কখনও তার ওপর মোঙ্গোল আক্রমণের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে, কখনও জাপানি আক্রমণে রক্তস্নাত রণক্ষেত্রে পরিণত হয় এই নগরী, আবার কখনও নব্য কনফুসিয়াসিজম-এর আঘাতে আহত হয় প্রাচীন ঐতিহ্য। বিদেশী শক্তি পরাধীন করতেই পারে, শক্তির দম্ভে আর আদিম প্রবৃত্তিতে বিজিতকে লাঞ্ছিত করতেও সে কুণ্ঠিত হয়না, লুণ্ঠিত হয় পার্থিব সম্পদ আবার নতুনের আহ্বানে আর অহমিকায় পদদলিত হয় পুরাতন সংস্কার - এই সবকিছুর-ই সাক্ষ্যবহন করে চলেছে গিয়ংজু। আনদং (Andong) থেকে গিয়ংজু সারাদিনে বেশ কয়েকটি বাস চলে, প্রথম বাস নয়টা পঞ্চাশ মিনিটে। প্রায় এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের পথ অতিক্রম করে যখন গিয়ংজু পৌঁছলাম তখন সাড়ে এগারোটা, বেশ খিদে পেয়েছে। আনদং থেকে দেগু (Daegu) হয়েও গিয়ংজু আসা যায় তবে অধিক দূরত্বের কারণে সময় বেশি লাগে। বাস টার্মিনালের ভিতরেই দু-তিনটে দোকান আছে, তারই একটাতে দুটো 'এমুগ' ('Eomug', একটি কোরিয়ান শব্দ যার অর্থ মাছ দিয়ে প্রস্তুত রুটি বা কেক) আর স্যুপ দিয়ে দ্বিপ্রাহরিক আহার সারলাম। আন্তর্নগর বাস প্রান্তিকের (Inter-city Bus Terminal) বাইরে রাস্তাটা পেরোলেই স্থানীয় বাসের অপেক্ষাকেন্দ্র। আমরা পুরোটাই জনপরিবহণের ওপর নির্ভরশীল কারণ সেটা অনেক বেশি সহজ আর অর্থসাশ্রয়ী। এর আরও একটা সুবিধা আছে, কোনো শহরকে ভালো ভাবে চিনতে জানতে বেশ সুবিধা হয়, অনেক বেশি সুযোগ থাকে মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময়ের।

পূর্বে ম্যংবালসান (Myonghwalsan, কোরিয়ান শব্দ 'সান' কথাটির অর্থ পর্বত), পশ্চিমে সন্দসান (Sondosan), উত্তরে কুমগাংসান (Kumgangsan) আর দক্ষিণে নামসান (Namsan), চর্তুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত অতীতের মহানগর 'সেওরাবেওল' (Seorabeol) বর্তমানে শহুরে-গ্রাম্য সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা গিয়ংজু শহর প্রায় আড়াই লক্ষাধিক মানুষের বাসভূমি। ইতিহাস পর্যবেক্ষণে সময়ের পর্যায়ক্রমের ভূমিকা অপরিসীম আর তাই সময়কে অনুসরণ করে আমাদের প্রথম গন্তব্য 'বুলগকসা বৌদ্ধ মন্দির' (Bulguksa Temple)।

বুলগকসা মন্দিরের পথে

৫৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সারো (Saro) উপজাতীয় পাক হায়েকজেওসা (Pak বা Park Hyeokgeose) সিল্লা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তী উনবিংশতম রাজা নুলজি (Nulji) -র সময়কালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারলাভ করে। ৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজা বেওফেউং (Beopheung বা Beobheung) -র সময়কালে তোহামসান (Tohamsan) পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম ঢালে প্রতিষ্ঠিত হয় বুলগকসা বৌদ্ধ মন্দির। জানা যায় সেই সময় এটি 'হাওমপুলগকসা' (Hwaompulgoksa) বা 'পপন্যুনসা' (Popnyunsa) নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে রাজা গিয়ংদক (Gyeongdeok) -র রাজত্বকালে মন্ত্রী কিম তে-সং (Kim Tae-seong বা Gim Dae-seong, এদেশে প্রথমে পারিবারিক নাম এবং পরে প্রদত্ত নাম বলা রীতি) মন্দিরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণ করেন। ৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় আশিটি কাষ্ঠনির্মিত মন্দির ভবন নিয়ে গড়ে ওঠা মন্দিরটির নামকরণ হয় 'বুলগকসা' যার আক্ষরিক অর্থ 'বুদ্ধের দেশ' অথবা শান্তির ভূমি যেখানে মানুষ প্রাচুর্য আর আনন্দে বসবাস করেন।
১১ নং রুটের বাসে চড়ে পাহাড়ের পাদদেশে নামলাম, রাস্তা পার হয়ে রয়েছে তথ্যকেন্দ্র। অধিকাংশ তথ্যপুস্তিকা কোরিয়ান ভাষায়, কিছু চাইনিজ কিংবা জাপানিজ ভাষায়ও রয়েছে। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা উঠে গেছে মন্দিরপ্রাঙ্গণের উদ্দেশ্যে, সে পথ অনুসরণ করে চারপাশের অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতিকে অনুভব করতে করতে পৌঁছলাম মন্দিরের মুখ্য প্রবেশপথে। প্রবেশপথের ডানদিকে রয়েছে টিকিট বিক্রয়কেন্দ্র আর বামপার্শ্বে মন্দিরটির মানচিত্র আর বিবরণী, দেখলাম একটি পর্যটকের দলকে গাইড বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবেশমূল্য পাঁচ হাজার কোরিয়ান 'ওন' (won), টিকিট নিয়ে মুখ্য প্রবেশপথ 'ইলজুমুন' দ্বারে (Iljumun Gate) টিকিট পরীক্ষা করে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

ইলজুমুন প্রবেশদ্বার

এই প্রবেশদ্বারটি কিন্তু ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরটির পুনঃনির্মাণের সময়ে নির্মিত। মূলমন্দিরে প্রবেশের বেশ কিছুটা পূর্বেই এই দ্বারটি, জোসেওন রাজত্বের (Joseon Dynasty) নির্মাণশৈলীকে অনুসরণ করেই এই প্রবেশদ্বারের স্থাপনা। ইতিহাসকে কী সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করা হয় এ দেশে ! কিছুটা রাস্তা অতিক্রম করে পৌঁছলাম 'চন্বাংমুন' (Chonwangmun) প্রবেশদ্বারে।

দূর থেকে চন্বাংমুন প্রবেশদ্বার

এই প্রবেশদ্বারটি কিন্তু ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরটির পুনঃনির্মাণের সময়ে নির্মিত। মূলমন্দিরে প্রবেশের বেশ কিছুটা পূর্বেই এই দ্বারটি, জোসেওন রাজত্বের (Joseon Dynasty) নির্মাণশৈলীকে অনুসরণ করেই এই প্রবেশদ্বারের স্থাপনা। ইতিহাসকে কী সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করা হয় এ দেশে ! কিছুটা রাস্তা অতিক্রম করে পৌঁছলাম 'চন্বাংমুন' (Chonwangmun) প্রবেশদ্বারে। এটিই মূলমন্দিরের প্রবেশের মুখ্যদ্বার যার অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান করছেন মন্দিরের চতুর্দিকের রক্ষাকর্তা চারজন দেব। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্বাস আর সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা এই চারজন দেব চরিত্র। ভারতীয় ধারণা থেকে সৃষ্ট দেবগণের বহিরঙ্গে রয়েছে এদেশীয় শৈল্পিক চেতনা। দেখলাম এদেশীয় পর্যটকেরা প্রত্যেকেই হাতজোড় করে মাথা নিচু করে দেবতাদের প্রণাম করে মন্দিরে প্রবেশ করছেন।

'চঙ্গুন্য' অর্থাৎ নীল মেঘের সেতু

ভিতরে প্রবেশের পর ডানদিকে রয়েছে স্মারকদ্রব্যের পসরা আর পানীয়ের ভেন্ডিং মেশিন। সামনেই 'পম্যংনু' (Pomyongnu Pavilion) পটমণ্ডপের প্রবেশপথ, বিশাল সিঁড়ি উঠে গেছে। গ্রানাইট প্রস্তরের নির্মিত আঠারোটি সিঁড়ি নিয়ে তৈরি 'চোঙ্গুন্য' ('Chongungyo') যার অর্থ নীল মেঘের সেতু, ভূমি থেকে মন্দিরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এটিকে 'সেতু' বলা হয়েছে বলেই বোধহয়) সোজা 'তিউংজন' (Taeungjon) ভবনের সম্মুখে পৌঁছে দেয়, আর পাশে ষোলোটি সিঁড়ি নিয়ে নির্মিত 'পিগুন্য' ('Paegungyo', যার অর্থ মেঘের সেতু) ভবন বা মূল মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। তবে এগুলি আজ সংরক্ষিত, ব্যবহার করা হয়না।

'পম্যংনু' পটমণ্ডপের অভ্যন্তরে প্রবেশের মুখে

ডানপাশের রাস্তা দিয়ে উঠে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশের পরই চোখে পড়বে মন্দিরপ্রাঙ্গণে অবস্থিত দুটি প্যাগোডা যথাক্রমে 'শাক্যটপ' (Seokgatap) প্যাগোডা আর 'ডাবটাপ' (Dabotap) প্যাগোডা। উচ্চতায় ৮.২ মিটার প্রস্তরনির্মিত ত্রিস্তরীয় 'শাক্যটপ' প্যাগোডা-র নামকরণ 'শাক্যমুনি' (Sakyamuni)-র অনুসারে হয়েছে। 'শাক্যটপ'-র পাশে অবস্থিত 'ডাবটাপ' প্যাগোডাটি উচ্চতায় ১০.৪ মিটার। ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা গিয়ংদক-এর রাজত্বকালে প্রস্তরনির্মিত প্যাগোডাটি 'প্রভুত্বরত্ন বুদ্ধ'-র উদ্দেশ্যে সমর্পিত। সামনেই 'তিউংজন' ভবন, মূল মন্দির।

মন্দিরের ভিতরে রয়েছে বিশালাকার শাক্যমুনি, অবিনশ্বর আত্মার অভিপ্রয়াণ এবং শরীরধারণ-কে শৈল্পিক চেতনার সঙ্গে মিশিয়ে এখানে তিনটি বুদ্ধের অবস্থান প্রদর্শিত, আর তাঁদের দুদিকে রয়েছেন ভগবান বুদ্ধের দুই শিষ্য কাশ্যপ আর আনন্দ। মন্দিরের অভ্যন্তরের ছবি তোলা নিষিদ্ধ, তাই সেটা মানস চিত্রপটে সযত্নে রেখে দিলাম আর মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করে ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম। 'তিউংজন' ভবনের পরেই অবস্থিত 'মুসলজন' (Museoljeon) ভবনটি। এটি মূলত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আলাপ-আলোচনা আর বক্তব্য রাখার স্থান। জানা যায় রাজা মুন্মু (Munmu) এই ভবনটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উইসাং (Uisang) সহ দশজন বৌদ্ধভিক্ষু বা সন্ন্যাসীকে এস্থানে নিয়মিত বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মের ওপরে আলোচনা ও বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করেন। 'মুসলজন' ভবনের পশ্চাতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলে দেখা পাওয়া যায় অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি মন্দির ভবন যথাক্রমে 'ক্বানুমজন' (Gwon-eum-jon) এবং 'বিরোজন' (Bi-ro-jon) ভবন নামে পরিচিত। 'ক্বানুমজন' ভবনে দেবী অবলকিতেশ্বরা বোধিসত্ত্ব পূজিত হন। ধর্ম আর শান্তির বাণী আজও উচ্চারিত হয় পাহাড়ের কোলে শায়িত মন্দিরের প্রতিটি কোণে। এই মন্দিরটি ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জাপানি আক্রমণের সময় সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয় এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশকে পুনর্নির্মাণ করা হয়। প্রায় দুইশত বৎসর বিদেশী শক্তির হাতে পরাধীন আমার মতন ভারতীয় সহজেই অনুভব করতে পারে বিদেশী শক্তির পরাক্রম প্রদর্শনের পথকে কিন্তু সেই পরাক্রম কালের নিয়মে অনন্তস্থায়ী হয়না, সে বিলুপ্ত হয়, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পরে, নৃশংসতা আর অমানবিকতার প্রতীকরূপে ঘৃণা আর উপেক্ষিত হয় আর যাকে সে বিধ্বস্ত করেছিল সে বাহ্যিক ধ্বংসের পরেও শান্তির বাণী প্রচার করে, চিরকালীন প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। সেই শান্তির বাণীকে হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে অনুভব করে ফিরে এলাম পাহাড়ের পাদদেশে।

জানা যায় ১২ খ্রিস্টাব্দে কোরিয় (বা গোরীয়) রাজবংশের সময়ে Huh Doryong প্রথম এই মুখোশগুলি তৈরি করেন। মূলতঃ চোদ্দটি ভিন্ন ধরনের মুখোশ ছিল গোড়ায়, যার মধ্যে তিনটি মুখোশ (Chongak বা বিবাহের বর, Byulchae and Ttuckdari-t'al) হারিয়ে যায়, বাকি এগারটি মুখোশকে ('Imae' বা বোকা, 'Ch'oraengi' বা দ্রুত নির্বোধ হস্তক্ষেপকারী, 'Kakshi' বা বিবাহের কনে, 'Chuji' বা সিংহ, 'Paekchong' বা কসাই, 'Halmi' বা বৃদ্ধা বিধবা, 'Chung' বা বৌদ্ধ সাধু, 'Yangban' বা অভিজাত, 'Sonbi' বা পন্ডিত এবং 'Pune' বা ছেনাল নারী) কে জাতীয় সম্পত্তির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করলাম এদের মধ্যে Yangban খুব প্রচলিত। মুখোশগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলো আনন্দ, পরিতোষ, ক্রোধ আর দুঃখের প্রকাশ করে। শুনলাম রাজার সামনে এই মুখোশ পরে নৃত্যনাট্য (মূলতঃ সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর আধারিত) পরিবেশিত হত, পূর্বোল্লেখিত চারটি আবেগের মধ্যে কোনটি দৃষ্টিগোচর হবে তা রাজার প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করতো। মুখোশনৃত্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা বলাই বাহুল্য।

বুলগকসা মন্দিরের বিভিন্ন অংশ

এখান থেকে ১২ নং রুটের বাসে চললাম 'সক্কুরাম' গুহা (Sokkuram Grotto) দেখতে, ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাহেতু নির্মিত এই গুহা। তহামসান পর্বতের পাথর কেটে এই গুহা নির্মাণ ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা গিয়ংদক -র আমলে মন্ত্রী কিম তে-সং-র তত্ত্বাবধানেই শুরু হয় যদিও এটির সম্পূর্ণ নির্মাণ কিম তে-সং দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর (৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) কয়েরবছর পর গুহাটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। গুহার মধ্যে রয়েছে ভগবান বুদ্ধের এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন দেবগণের পাথরের খোদিত মূর্তি। গুহামন্দিরের প্রধান শাক্যমুনির মূর্তিটি উচ্চতায় ১৬ ফুট, পদ্মের ওপর ভগবান বুদ্ধ পদ্মাসনে বিরাজমান। কোরিয়ার তিন রাজবংশের শাসনকালের স্মৃতিকথা 'সামগুক ইয়ুসা'-য় বুলগকসা মন্দির আর সক্কুরাম গুহা মন্দির নির্মাণের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। জানা যায়, গিয়ংজু-র সীমান্ত অঞ্চলে মরিয়াং-রি নামক স্থানে কিম তে-সং নামের এক দরিদ্র ব্যক্তি তাঁর মায়ের সঙ্গে বসবাস করতেন। প্রতিবেশীর জমিতে চাষের কাজ করেই কোনোরকমে তাঁদের জীবননির্বাহ হত। একদিন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে তে-সং শুনতে পান যে 'তুমি ভগবান বুদ্ধকে যতটা দান করবে, ভগবান তাঁর দশ হাজার গুণ ফিরিয়ে দেবেন'। ধার্মিক তে-সং ধানের একটি ছোট আবাদি জমি ভগবানের উদ্দেশ্যে দান করেন, এই ছোট চাষের জমিটি তিনি তাঁর মালিকের থেকে পেয়েছিলেন। এর কয়েক মাসের মধ্যেই তে-সং যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তৎকালীন মন্ত্রী কিম মুন-ইয়াং একটি আকাশবাণী শুনতে পান, আকাশবাণীটি বলে যে মরিয়াং-রি অঞ্চলের বাসিন্দা কিম তে-সং তাঁর পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন। অনতিকালের মধ্যেই কিম মুন-ইয়াং-র স্ত্রী গর্ভবতী হন এবং এক পুত্রসন্তানের জননী হন। আকাশবাণীটি স্মৃতিতে রেখে শিশুটির নামকরণ করা হয় কিম তে-সং এবং তাঁর পূর্বজন্মের মা কে আমন্ত্রণ করে শিশু তে-সং-র দেখভালের জন্যে নিয়ে আসা হয়। বড় হয়ে কিম তে-সং একজন ধর্মনিষ্ঠ মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে তিনি আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ছিলেন এবং মন্ত্রীপদাসীন হয়েছিলেন। কিম তে-সং তাঁর দুই মাতা পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে বুলগকসা মন্দির আর সক্কুরাম গুহা নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন।

কাহিনিটি সত্যিই খুব হতবাক করেছিল কারণ দক্ষিণ কোরিয়ার এই কাহিনিটির সঙ্গে ভারতীয় ভূখণ্ডের সম্রাট অশোকের ঘটনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। প্রচলিত আছে যে সম্রাট অশোক তাঁর পূর্বজন্মে বাল্যাবস্থায় ভিক্ষু গৌতমকে কিছু মাটি (যা দিয়ে সে খেলছিল) ভিক্ষা প্রদান করেন, অত্যন্ত খুশি হয়ে গৌতম তাঁর ভিক্ষু সাথীদের বলেন যে এই বালক পরবর্তী জন্মে এক সুবিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি হবে। এটি প্রচলিত কাহিনি মাত্র, তবে আশ্চর্য হলাম কাহিনিদ্বয়ের সাদৃশ্য দেখে।

ডংগুং প্রাসাদের পুনঃনির্মিত তিনটি ভবন

এবার ফেরা, প্রথমে ১২ নম্বর বাসে বুলগকসা, সেখান থেকে আবার ১১ নম্বর বাস ধরে পরবর্তী গন্তব্য 'ডংগুঙ' প্রাসাদ ('Donggung Palace' যেটি ছিল রাজকুমারের প্রাসাদ; কোরিয়ান শব্দ 'Dong' কথাটির অর্থ 'পূর্ব' আর 'Gung'-র অর্থ 'প্রাসাদ' অর্থাৎ 'ডংগুঙ'-র আক্ষরিক অর্থ পূর্বের প্রাসাদ) আর 'উলজি' জলাশয় (Wolji Pond)।

উলজি জলাশয়

অবিভক্ত সিল্লা সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান প্রাসাদ এটি। 'সামগুক সাগি' ('Samguk Sagi' কোরিয়ার তিন রাজত্বের যথা সিল্লা, গোগরীয় এবং ব্যাকজে-র ঐতিহাসিক দলিল) থেকে জানা যায় রাজা মুন্যু তাঁর শাসনকালের ১৪তম বৎসরে ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে 'উলজি' জলাশয়টি খনন করান এবং এই জলাশয়টিকে কেন্দ্র করে ৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে 'ডংগুঙ' রাজপ্রাসাদটি স্থাপন করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য থেকে জানা যায় এখানে সর্বমোট ছাব্বিশটি বৃহৎ ভবন এবং কিছু ক্ষুদ্র স্থাপত্য ছিল। তিনটি ভবনকে সংরক্ষণ করা হয়েছে, অবশিষ্ট তেইশটি ভবন আজ ভূমির অভ্যন্তরে প্রোথিত। একটি ভবনে পুরাতাত্ত্বিক বিভিন্ন নিদর্শনের প্রদর্শনী রয়েছে। সেখানে রয়েছে বিশালাকায় ঐতিহাসিক প্রাসাদটির একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিমূর্তি। পাথর, পোড়া মাটি এমনকি ধাতুর ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। ওককাষ্ঠনির্মিত একধরণের বাদ্যযন্ত্র, কাচ আর প্রাণীর হাড়ের তৈরী অলংকার প্রভৃতি রাখা রয়েছে প্রদর্শনীতে। রাতের বেলায় 'উলজি' সেজে ওঠে রঙবেরঙের আলোর সাজে, কিন্তু ফিরতে হবে, আনদং যাওয়ার শেষ বাস সন্ধ্যে সাতটায়। অতএব এবারকার মত এখানেই বিদায় নিতে হবে।

ডংগুং প্রাসাদের প্রাঙ্গণে

গবেষণাগারে কাজের থেকে অব্যাহতি পেলেই সম্পত ঘোষ বেরিয়ে পড়েন নতুন কিছুর খোঁজে। সাইকেল চালানোটা খুব মিস করি, আজকাল হয়ে ওঠেনা, বই পড়া আর বেড়ানোর পরিকল্পনা করাটা চালিয়ে যাচ্ছেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

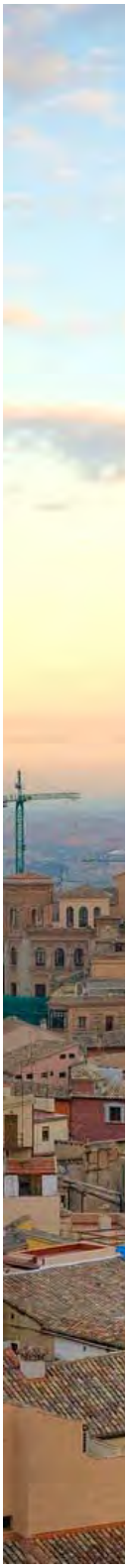

স্পেনে - মাদ্রিদ ও টোলিডোয়

সিদ্ধার্থ চৌধুরী

স্পেনে যাবার আইডিয়াটা ছিল স্ত্রীর। গরমের ছুটিতে দশদিনের জন্যে স্পেনে বেড়াতে গেলে কেমন হয়? বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপের মধ্যে স্পেনই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ। যাহা বলা তাহা কাজ! বাড়ির সবাইকার সম্মতি পেয়ে স্পেনে যাবার ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেলো। আমার এক বিশেষ বন্ধু স্পেনে মাদ্রিদে থাকবো শুনে টোলিডো বলে একটা শহর দেখতে বলেছিল। ঠিক করেছিলাম টোলিডোতে যাব। প্রাচীন স্পেনের সুন্দর নিদর্শন। মাদ্রিদ থেকে বেশি দূরে নয়। কিন্তু নাকি ফ্যাসিনেটিং! স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থান বোঝানোর জন্য দেওয়া ম্যাপে দেখা যাচ্ছে স্পেনের উত্তর-পূর্বে ফ্রান্স, পশ্চিমে পর্তুগাল, দক্ষিণে জিব্রালটার প্রণালী এবং সেটা পেরিয়ে আরো দক্ষিণে গেলে শুরু হল আফ্রিকা। তার প্রথম দেশটা হল মরোক্কো। জলপথে ন্যূনতম দূরত্ব যার হল নয় মাইল। অবশ্য জিব্রালটার ক্রস করতে হবে। মাদ্রিদের দক্ষিণ দিকে একটু এগোলেই টোলিডো।

সালটা ২০১৭। ঠিক হলো ১০ অগাস্ট আমরা লস এঞ্জেলেস থেকে বেরোবো। প্রথম রাত্তিরে থাকবো মাদ্রিদে। পরের দিন সকাল বেলা বেরোবো টোলিডোর উদ্দেশ্যে। টোলিডোতে পাঁচঘন্টা কাটিয়ে আবার মাদ্রিদে চলে আসব। যদিও পুরো ট্রিপটা চারটে বড় জায়গায় থাকবার জন্যে ঠিক করেছিলাম, এই লেখাটা শুধু কিছুটা মাদ্রিদ এবং টোলিডোতে আমাদের পাঁচঘন্টা অবস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মাদ্রিদ

কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাতটায় মাদ্রিদে নামলাম। এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতে কোনো ঝামেলা নেই। আটটা নাগাদ এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে এসে দেখি অনেক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। প্লেনে সারাক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। সুন্দর রোদে ঝলমল সকাল। আমার প্রথম ইউরোপে ট্যাক্সি চড়া। একটা অজানা রোমাঞ্চ যেন সারা গায়ে কাঁটা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আমি ড্রাইভারের পাশে বসে আর আমার স্ত্রী এবং দুই মেয়ে পেছনের সিটে। সেলফোনে রাস্তার আশপাশের ফটো তুলছিলাম। একটা জিনিস বিশেষ ভালো লাগলো না। রাস্তার দুপাশের দেওয়ালে শুধু গ্র্যাফিত্তি। লস এঞ্জেলেস বা নিউ ইয়র্কের ফ্রিওয়েগুলোর পাশের দেওয়ালে গ্র্যাফিত্তি দেখতে দেখতে একটা যেন বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে মনের মধ্যে। স্পেনে এসেও একই জিনিস দেখতে হবে ভাবিনি। গ্র্যাফিত্তি হলো দেওয়ালে আঁকা ছবি। সুন্দরভাবে আঁকা থাকলে তা হয়তো দৃষ্টিনন্দন হয়। তাই না? দা ভিঞ্চি বা নন্দলাল বসু আঁকলে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তাঁদের মতো আর্টিস্টদের সময় নেই বা প্রবৃত্তি নেই। আমেরিকা বা ইউরোপেও সেই একই অবস্থা। ব্যাপারটা মেনে নিতে হবে। অনেক কথা ভাবতে ভাবতে হোটেলে পৌঁছে গেলাম। সন্নিহিত অঞ্চল অনেক পুরোনো দিনের। কিন্তু পরিষ্কার। হোটেলটাতে নতুন এবং পুরনোর সংমিশ্রণে যেন নতুনেরই জয় হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল।

Riverac / CC BY

হোটেলে এসে জিনিসপত্তর নামিয়ে ঠিক করা হল শহরটাকে দেখতে হবে। স্পেনে আসার আগে আমার লস এঞ্জেলেসের বন্ধুদের মধ্যে যারা আগে ঘুরে স্পেনে ঘুরে গেছে তাদের সঙ্গে স্পেনে কী করা উচিত, কী দেখা উচিত তা নিয়ে কথা বলেছিলাম। পরের দিনের জন্যে প্রথমেই হোটেলের রিসেপশন ডেস্ক থেকে টোলিডোর টিকেটটা কিনেছিলাম। কিন্তু আজকে কী করব? হোটেল থেকেই 'হপ-ইন-হপ আউট' বাসের টিকেট কিনে ফেললাম। আমরা লাল রুটের বাসের টিকেট কিনেছিলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই বাসগুলো সারাদিন নিজেদের রুটে চলে। সারা মাদ্রিদে চারটে এরকম রুট আছে লাল-নীল-সবুজ এবং হলুদ। এক-একজনের প্রতিদিনের জন্যে পঁচিশ ইউরো খরচা করলে যে কোনো রুটের বাস এক্সচেঞ্জ করা যেতে পারে। কতকগুলো স্টপেজ আছে যেখানে সব রুটের বাসই দাঁড়ায়। আপনাকে একটা ম্যাপ ধরিয়ে দেবে। ব্যাপারগুলো বেশ জটিল। আগে থেকে রিসার্চ করে না এলে কোথায় কোথায় থামতে হবে সেগুলো বার করতেই বেশ সময় লাগে। আপনার কাছে হয়তো লাল রুটের বাসের টিকেট আছে। এর পরে কোনো জায়গা আপনি যদি দেখতে চান সেটা হয়তো সবুজ রঙের রুটের আওতায় পরে। সুতরাং আপনাকে দেখতে হবে কোন কোন জংশনে লাল রুটের টিকেট দেখিয়ে সবুজ রুটের টিকেটের বাসগুলোতে ট্র্যান্সফার করা যায়। আপনার পরের দেখবার জায়গাটা হয়তো নীল রুটের বাসগুলো থেকে যেতে হবে। এই মুহূর্তে আপনি হয়তো সবুজ রুটের বাসে আছেন। আপনাকে দেখতে হবে কোন জংশনে নীল এবং সবুজ রুটের বাসেরা দাঁড়ায়। ব্যাপারটা কী বলছি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। ধরুন আপনি এই মুহূর্তে হলদে রুটের বাসে আছেন। আপনাকে হোটেলে ফিরতে হলে লাল রুটের বাসে উঠতে হবে। আপনার হলদে এবং লাল রুটের জংশন থেকে লাল রুটের বাস ধরতে হবে। ঠিকমত প্ল্যানিং না করতে পারলে আপনার সেই রাতে বাসে করে হোটেলে ফেরা নাও হতে পারে। 'জয় কালী, যা হবার হবে' বলে সকাল সাড়ে দশটার সময় বেরিয়ে পড়া গেল। সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাসে উঠে পড়লাম। শুরু করেছিলাম লাল রুটে। এদিক ওদিকে তাকাচ্ছি আর অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। ঐশ্বর্য আর ঔদ্ধত্য যেন উথলে উথলে পড়ছে। ঔদ্ধত্যটা কিন্তু মার্জিত। স্পেনের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার খুব একটা ধারণা নেই। তবে যা দেখছিলাম তাতে বুঝতে পারছিলাম এই এতো ঐশ্বর্য, এতো প্রাচুর্য্যের পেছনে আছে অনেক খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকের প্রবঞ্চনা, স্প্যানিশ উপনিবেশের অত্যাচার এবং তার সঙ্গে মিশে আছে আফ্রিকা এবং উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার দুঃস্থ মানুষদের কান্না এবং রক্ত। প্রথমে যে স্টপেজে নামলাম সেটা হলো বিশ্বখ্যাত 'ডেল প্রাডো মিউজিয়াম'।

OsvaldoGago / CC BY

ডেল প্রাডো বা সংক্ষেপে প্রাডো মিউজিয়াম স্পেনের বা বলতে গেলে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর্ট মিউজিয়ামগুলোর মধ্যে অন্যতম। মিউজিয়ামটি তৈরি হয়েছিল ১৮১৯ সালে - মূলতঃ চিত্র এবং ভাস্কর্য প্রদর্শনীর মিউজিয়াম হিসেবে। স্প্যানিশ পেন্টারদের মধ্যে ফ্রান্সিস্কো গোইয়া, দিয়েগো ভ্যালেসকুয়েজ, সালভাদোর দালি, পাবলো পিকাসো ছাড়াও এল গ্রেকো, হিয়েরোনিমোস বস্ক, তিশিয়ান, পিটার পল রুবেন্স এবং আরও নানান নামী-অনামী শিল্পীর বিশাল আর্টের সংগ্রহ এখানে আছে। এছাড়াও ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং রাশিয়ান পেইন্টারদের আঁকা ছবিও এই মিউজিয়ামে রয়েছে। চোখের সামনে এত সব ছবি দেখতে দেখতে যেন নির্বাক হয়ে যাচ্ছিলাম। এইসব অনুভব করার জন্য সমঝদার হবার দরকার নেই। টু ডাইমেনশন্যাল ছবি শিল্পীর আঁকার গুণে যেন থ্রি ডাইমেনশন্যাল বলে মনে হচ্ছিল। বিশাল বিশাল ফ্রেমে বাঁধানো ক্যানভাস সব দেয়ালে লাগানো - দেখলে বিশ্লেষণ না করে সরতে ইচ্ছে করে না। ছবি তোলা নিষেধ। প্রত্যেকটি ছবির একটা করে ইতিহাস আছে। অনেকগুলিই স্পেনের রাজা রানি এবং রাজবংশের বিভিন্ন লোকেদের সম্মিলিত চিত্র। মনে হচ্ছিল যেন ছবির কোনো চরিত্রকে প্রশ্ন করলে সে ছবি থেকে নেমে এসে জবাব দেবে। এতো জীবন্ত! আফসোস লাগছিলো ছবি তুলতে পারা যাবে না বলে। ঘন্টাদুয়েক মিউজিয়ামে ঘুরে বেরিয়ে পড়া গেলো। মিউজিয়ামের পাশেই একটা বোটানিক্যাল গার্ডেন। নাম 'রিয়েল জারদ্যাঁ বোটানিকো দি মাদ্রিদ'। কিছুক্ষণ বাগানে ঘুরে একটা গাছের নিচে এসে বসলাম। মেয়েরা বললো ওরা আরো কিছুক্ষণ বাগানে ছবি তুলবে। তথাস্তু! গাছের ছায়ায় বসে চোখটা যে কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা মনে নেই। বউয়ের হাতের ঠেলায় উঠে পড়লাম। মেয়েরা ফিরে এসেছে। রাস্তা ক্রস করে একটা রেস্তোরাঁতে বসে ভালো করে খেয়ে আবার বাসে উঠে পড়লাম।

মাদ্রিদের রাস্তায় আমাদের বাস চলছে। ডানদিকে বাঁদিকে যেদিকে তাকাই দেখি পুরোনো সুন্দর সুন্দর বাড়ি, চার্চ, লাইব্রেরি, ক্যাথিড্রাল আর ব্যাসিলিকার ছড়াছড়ি। কোনটা হয়তো পাঁচশো বছরের পুরোনো আর কোনোটা হয়তো হাজার বছরের পুরোনো। বেশ কিছুক্ষণ পরে মেয়েরা একটা স্টপেজে নেমে পড়তে বললো। একটু হাঁটলেই নাকি একটা প্যালেসে গিয়ে পৌঁছবো। কোথায় প্যালেস? বাসস্টপ থেকে প্রায় এক মাইল হেঁটে একটা বেশ সুন্দর জায়গায় এসে পৌঁছলাম। একটা সুন্দর হাঁটার জায়গা। সামনে রেলিং এবং রেলিংয়ের পেছনে একটা সুন্দর লেক। অনেক বেলা হয়েছে। লেকের পাশ দিয়ে হেঁটে যদি প্যালেসে পৌঁছনো যায় সেই ভেবে হাঁটতে শুরু করলাম। সুন্দর চওড়া রাস্তা আর দুপাশে লম্বা লম্বা গাছ। মাঝে মাঝে বসবার জন্যে বেঞ্চ। মাইল দুয়েক হাঁটার পরেও প্যালেসের খোঁজ পাওয়া গেলনা। আজ প্রায় আট মাইল হাঁটা হয়ে গেছে। পার্কটা ভারী সুন্দর। দুপাশে নানারকম মনোরঞ্জক গাছের সারি। সুন্দর বাতাস বইছে। পেট ভরপুর। কোনো কিছু চিন্তা না করে ওই গাছের বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। প্রায় সাড়ে আট মাইল হন্টন হয়ে গেছে। সুতরাং নিদ্রা অনিবার্য। নিদ্রা ভাঙলো ছোট মেয়ের গলা শুনে। স্থানকাল ভুলে একটা পাবলিক প্লেসে আমি নাকি নাক ডেকেছিলাম বা আমার নাসিকা গর্জন করেছিল। আমার মনে নেই। এই প্রাসাদটা বোধহয় আজ আর দেখা হবে না। লাল বাসের দেখা নেই। একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফেরার কথা বলতে দেখলাম অন্যদের কোনো আপত্তি নেই। সুতরাং আরো দেড় মাইল হেঁটে একটা বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে সবাই মিলে ট্যাক্সি ধরার জন্যে দাঁড়ালাম। অজানা অচেনা শহরে আমি রাত্তির বেলায় তিনজন মেয়েকে নিয়ে পথ হারাতে চাই না। দুমিনিটের মধ্যে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেলো। সবাই ক্ষুধার্ত। মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলাম কে কী খেতে চায়। সবাই 'পায়া' খেতে চায়। পায়া হচ্ছে স্প্যানিশদের অত্যন্ত পছন্দের খাবার। অনেকটা আমাদের বিরিয়ানির মতো। মেয়েরা হোটেলের রিসেপশনিস্টের সঙ্গে বাসট্রিপ শুরু করার আগে রেস্তোরাঁর নামধাম সব জেনে এসেছিল। হোটেলের আশেপাশের কোনো রাস্তাতেই আছি। রেস্টুরেন্টটা যেন ধরা দিতে চাইছে না। গুগুল ম্যাপে খোঁজাখুঁজি চললো বহুক্ষণ ধরে। মাদ্রিদের রাস্তা যেন উত্তর কলকাতার গলিগুলোর মতো। আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি যেন জ্বলে যাচ্ছিল। বাকি সবাইকার একই অবস্থা। অবশেষে পায়াকে ক্ষমা দিয়ে একটা চব্বিশ ঘন্টার স্যান্ডউইচের দোকানে খেয়ে ট্যাক্সি চড়ে হোটেলে ফিরলাম। হোটেলের দু-একটা ব্লক পেছনে ছিলাম আমরা। ট্যাক্সির ভাড়া উঠলো মাত্র সাড়ে চার ইউরো। মাদ্রিদের প্রথম রাত। সাড়ে চার ইউরোর বদলে পাঁচ মিনিট বসার সুযোগ পাওয়াও যেন একটা পাওনা। ছোট মেয়ে সেলফোনে দুএকটা বাটন টিপে বলল ' আমরা আজ সাড়ে দশ মাইল ওয়াক করেছি।'পরেরদিন সকাল সাতটায় হোটেলের লবি থেকে ট্যুর কোম্পানির লোক আমাদের নিয়ে যাবে। সুতরাং সকাল ছটার সময় উঠে পড়তে হবে। জামাকাপড় ছেড়ে সেলফোনে ছটার সময় অ্যালার্ম দিয়ে বিছানায় শুয়েই ঘুম।

অ্যালার্মের শব্দে ঘুম না ভাঙলে বোধহয় অনন্তকাল ঘুমোতে পারতাম। প্রথম কাজ মেয়েদের ঘুম থেকে তুলে দিয়ে রেডি হতে বলা। ওরা পাশের ঘরেই ছিল। দরজায় টোকা মারতেই প্রবল আপত্তি। 'উই উইল বি রেডি বাবা, ডোন্ট ওরি' শুনে নিজের ঘরে ফিরে এসে কুড়ি মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গেলাম। উল্টোদিকেই একটা রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু মাফিন, টোস্ট এবং কফি তুলে নিয়ে হোটেলের লবিতে ফিরে এলাম ছটা বেজে বাহান্ন মিনিটে। ছটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে মেয়েরা লবিতে এল। সেখানে বসেই আমরা গোগ্রাসে খাবারগুলো খেতে শুরু করলাম। ট্যুরকোম্পানির এক মহিলা রিসেপশন ডেস্কে এসে পৌঁছলেন সোয়া সাতটা নাগাদ। স্প্যানিশদের এই গা-ছড়ানো ভাবটা আমার ভালোই লাগছিলো। বাসে উঠলাম সাড়ে আটটা নাগাদ। যাচ্ছি টোলিডোতে।

টোলিডো

বাসে তো উঠলাম। বাসটা এদিক সেদিক ঘুরে এই হোটেলে ওই হোটেলে লোক তুলে যখন সত্যিকারের যাত্রা শুরু করলো তখন প্রায় দশটা বাজে। বাসে মাদ্রিদ থেকে টোলিডো মাত্র দেড় ঘন্টার পথ। একটা সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাসটা দাঁড়ালো। এর পরে একটার পরে একটা এস্কালেটরে চড়ে আমরা প্রায় দু-তিন হাজার ফুট ওপরে পৌঁছে গেলাম। আমাদের গাইড ছিল ভারী সুন্দরী কিন্তু ইংরেজি বলতে পারছিলো না। ভীষণভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছিলো আমাদের ইংরেজিতে বোঝানোর।

টোলিডো সেন্ট্রাল স্পেনের একটা নামকরা ঐতিহাসিক শহর। ১৯৮৬ সালে ইউনেস্কো টোলিডোকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। স্পেনের অনেক নামী লোকজন টোলিডোতে বসবাস করেছেন। যাদের মধ্যে আছেন ব্রূনহিলডা অফ অস্ট্রেশিয়া, আল -জারকালি, আলফনসো এক্স, গার্সিলাসো দে লা ভেগা, ইলিয়ানোর অফ টোলিডো এবং এল গ্রেকো। এঁদের সম্বন্ধে কিছু বলে নিই।

ব্রূনহিলডা অফ অস্ট্রেশিয়া - ব্রূনহিলডা সম্ভবতঃ জন্মেছিলেন ৫৪৩ সালে এবং বেঁচেছিলেন ৬১৩ সাল অবধি। ঠিক কতদিন উনি টোলিডোতে ছিলেন তা কেউ সঠিক বলতে পারবে না। উনি বিয়ে করেছিলেন মেরোভিঙিয়ানের রাজা সিগেবের্ট ওয়ান অফ অস্ট্রেসিয়াকে। তাঁকে ভীষণ নৃশংসভাবে খুন করা হয়।

আল -জারকালি - 'আবু ইশাক ইব্রাহিম ইবন ইয়াহিয়া আল নাককাস আল -জারকালি' বা সংক্ষেপে 'আল জারকালি' ছিলেন এক আরব মুসলিম যিনি নাকি বাদ্যযন্ত্র তৈরি করতেন। তিনি ছিলেন সেইসময়ের একজন জ্যোতিষী তথা জ্যোতির্বিদ। 'Arzachel- (আর্যাচেল)' নামে চাঁদের একটা ক্রেটার ওঁর নামে দেওয়া হয়েছে। জন্মেছিলেন টোলিডোর পাশে একটা গ্রামে ১০২৯ সালে এবং বেঁচেছিলেন ১০৮৭ সাল পর্য্যন্ত। এছাড়াও ধাতবদ্রব্য নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসতেন; তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিলো আল নেক্কাছ' বা 'খোদাইকার'। ১০৮৫ সালে খ্রীষ্টান রাজা আলফনসো সিক্স টোলিডো জয় করেন। আল জারকালি টোলিডো ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। কেউ জানেনা উনি কর্ডোবা বলে একটা শহরে পালিয়ে গিয়েছিলেন বা কোনো মুরিশ রেফিউজি ক্যাম্পে মারা গিয়েছিলেন কিনা।

আলফনসো এক্স - আলফনসো এক্স জন্মেছিলেন ১২২১ সালের তেইশে নভেম্বর এবং মারা যান চৌঠা এপ্রিল ১২৮৪ সালে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সেভিলে। আলফনসো এক্স ছিলেন এক বীরযোদ্ধা এবং রাজা। এছাড়াও ছিলেন একজন কবি, একজন কৃষক শ্রমিক নেতা এবং একজন প্রেমিক। উনি ছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী কিন্তু যে কোনো ধর্মের (মুসলিম, খ্রিস্টান বা ইহুদি) লোকজন ওনার দরবারে এসে তাঁদের দাবি বা মতামত ব্যক্ত করতে পারত এবং সুবিচার নিয়ে ফিরে যেতে পারত। ঠিক কতদিন উনি টোলিডোতে ছিলেন সেটা বলা মুশকিল।

গার্সিলাসো দে লা ভেগা - গার্সিলাসো দে লা ভেগা ছিলেন একাধারে একজন যোদ্ধা এবং কবি। সম্ভবতঃ জন্মেছিলেন ১৫০১ সালে এবং মারা যান ১৫৩৬ সালে, মাত্র পঁয়তিরিশ বছর বয়সে। কিন্তু তার মধ্যেই তাঁর অপরিসীম প্রতিভার দান স্পেনের সাহিত্যজগতে ছাপ ফেলেছিলো।

ইলিয়ানোর অফ টোলিডো - ইলিয়ানোর অফ টোলিডো জন্মেছিলেন ১৫২২ সালে এবং মারা যান ১৫৬২ সালে। উচ্চবংশীয় এই মহিলা খুব সুন্দরী ছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি স্পেনের একজন সন্মানীত নারী হিসেবে জীবন কাটিয়েছিলেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে উনি বিয়ে করেছিলেন তখনকার দিনের ইতালির বিখ্যাত মেদিচি ফ্যামিলিতে। তাঁর স্বামী ছিলেন 'কসিমো I ডি মেদিচি (Cosimo I de' Medici)'। স্বামী স্ত্রী দুজনেই ধার্মিক ছিলেন এবং তাঁদের দাম্পত্যজীবন ছিল অত্যন্ত সুখের এবং শান্তিপূর্ণ। বিবাহের তেইশ বছরের মধ্যে ওনাদের এগারোটি সন্তানসন্ততি হয়। বিয়ের পরে তাঁরা ইতালির ফ্লোরেন্সে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। তাঁদের জীবনযাপন খুব বিলাসবহুল ছিল। তৎকালীন ইতালিয়ান সমাজেও অত্যন্ত সম্মানীত ইলিয়ানোর অফ টোলিডো ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান 'পিসা' শহরে।

এল গ্রেকো - এল গ্রেকোর (বা 'দ্য গ্রীক') আসল নাম হলো ডোমেনিকাস থিওটোকোপোলাস। ১৫৪১ সালে গ্রীসের 'ক্রীট' নামে এক দ্বীপে উনি জন্মেছিলেন, যদিও সেই সময় দ্বীপটি 'রিপাবলিক অফ ভেনিস' এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতালির ভেনিস তখন এক সার্বভৌম শাসকের অধীনে ছিল। ভেনিসের শাসককে বলা হতো 'ডোগে অফ ভেনিস (Duke of Venice)' । কোনো 'ডোগে' মারা গেলে পরবর্তী 'ডোগে' কে হবেন তা ঠিক করতেন ভেনিসের অভিজাত নাগরিকেরা। সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির ওপরে এই কাজের ভারটা দেওয়া হত। ৬৯৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইতালির উত্তরপূর্ব অঞ্চলের মধ্যমণি ভেনিস নিজেদের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেছিল। 'এল গ্রেকো' ২৬ বছর বয়সে 'ক্রীট' থেকে ভেনিসে চলে যান। অন্যান্য গ্রীক আর্টিস্টরাও তাই করতেন। ১৫৭০ সালে উনি রোমে যান এবং একটার পরে একটা ছবির কাজ করেন।। ১৫৭৭ সালে 'এল গ্রেকো' প্রথমে মাদ্রিদে এবং ওই বছরেই পরে টোলিডোতে চলে আসেন।

গতকালই প্রাডো মিউজিয়ামে 'এল গ্রেকো'র ছবিগুলো অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখেছিলাম। একটা ছবি আমার মনে এখনো লেগে আছে। ক্যানভাসের ওপরে তেলরঙে আঁকা ছবিটি পনেরো ফুট দশ ইঞ্চি উঁচু এবং প্রস্থে এগারো ফুট আট ইঞ্চি।

José Luis Filpo Cabana / CC BY

ডন গঞ্জালো লুইস নামে সেইসময়ের একজন স্থানীয় খ্যাতনামা লোকের মৃতদেহ সমাধিস্থকরণের চিত্ররূপ। ডন গঞ্জালো লুইস ছিলেন টোলিডোর বাসিন্দা এবং টোলিডোর পাশেই 'অর্গাজ' বলে একটা শহরের একজন মাননীয় নাগরিক ছিলেন।

মৃত্যুর পরে তাঁর পরিবারকে 'কাউন্ট' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। 'কাউন্ট অফ অর্গাজ' ছিলেন একজন সত্যিকারের সুন্দর মানুষ। নানারকমভাবে মানুষকে সাহায্য করতেন তিনি। নানান চ্যারিটি ছাড়াও তিনি অনেক টাকা 'চার্চ অফ স্যান্টো ডোমে' কে দান করেন। এল গ্রেকো ওই চার্চেই যেতেন এবং 'কাউন্ট অফ অর্গাজ'-এর সমাধির সময় উনি উপস্থিত ছিলেন। কথিত আছে 'কাউন্ট অফ অর্গাজ' কে সমাধিস্থ করার সময় 'সেন্ট স্টিফেন' এবং 'সেন্ট অগাস্টিন' স্বর্গ থেকে নেমে আসেন এবং তাঁরা স্বহস্তে 'কাউন্ট অফ অর্গাজ'কে কবর দেন। ছবিটি মনে পড়ছিল - যেখানে তাঁকে কবর দেওয়া হচ্ছে, সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। হলুদ গাউন পরে দুজন হলেন 'সেন্ট স্টিফেন' এবং 'সেন্ট অগাস্টিন'। ঠিক পেছনে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং 'এল গ্রেকো'। নিচের লেভেলের সবাইকার ঠিক মাথার ওপরে আরেকটি স্তর। ওটা হচ্ছে স্বর্গ। সবচেয়ে ওপরে যীশুখ্রিষ্ট সাদা পোশাকে মোড়া। নিচে ম্যাডোনা, 'সেন্ট জর্জ' এবং 'দ্বিতীয় ফিলিপ' (যদিও উনি তখন বেঁচে ছিলেন)। নিচের লেভেলে কালো রঙের পোশাক পরা মানুষেরা যেন শোকের ছায়ায় মুহ্যমান। স্বর্গে যীশু এবং ম্যাডোনারা তাঁকে তুলে নেবার জন্যে প্রস্তুত। অসাধারণ ! মনে হচ্ছিল ওই যুগে যদি ফিরে যেতে পারতাম। অন্তত কয়েক ঘন্টার জন্যে।

টোলিডো বা ল্যাটিন ভাষায় টোলেটাম-এর কথা রোমান ঐতিহাসিক লিভির খ্রিস্টপূর্ব ৫৯ থেকে ১৭ খ্রিস্টাব্দ) বর্ণনায় আছে। লিভির কথা অনুযায়ী মার্কাস ফুলভিউস নোবিলিওর নামে একজন রোমান জেনারেল খ্রিস্টপূর্ব ১৯৩-তে টোলিডোর কাছেই একটা শহরে কিছু স্থানীয় উপজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে তাদের রাজা 'হিলেরমুস' কে বন্দি করেন। টোলিডোতে এই সময় 'কার্পেটানি' বলে একটা উপজাতি রাজত্ব করতো এবং এটা 'কার্পেটানিয়া' বলে একটা জায়গার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নোবিলিওর কার্পেটানিয়া জয় করে স্থানীয় লোকেদের রোমান নাগরিকত্ব দেন এবং টোলিডোর উন্নতির দিকে মন দেন। টোলিডোতে এই সময় অনেক রাস্তা, স্নানাগার, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, প্রাচীর এবং একটা উন্মুক্ত স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছিল (উন্মুক্ত স্টেডিয়ামকে তখনকার দিনে বলা হতো সার্কাস)। এখানে বাজি ধরে 'রথের দৌড়' (CHARIOT RACE) হত এবং যাবতীয় সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা মিটিং এই সার্কাসেই বা স্টেডিয়ামেই হতো। স্টেডিয়াম বা সার্কাসটাতে আনুমানিক পনেরো হাজার লোক ধরতো। ধরুন আজ থেকে ২২০০ বছর আগে এই সব ঘটনাগুলো টোলিডোতে হচ্ছিল। আমি মাঝে মাঝে বসে বসে ভাবছিলাম। গাইড আমাদের যে জায়গাটাতে তুলে এনেছিল সেটা টোলিডোর সবচেয়ে উঁচুতে। একটা চত্বরের মধ্যে নিয়ে এলো যেখানে পাশাপাশি সেন্ট ইগলেসিয়া চার্চ এবং পাশেই এল গ্রেকোর সমাধিস্থল।

Arturo Mann / CC BY-SA

রাস্তাটা বাঁক ফেরাতেই আরো একটা মিউজিয়াম ভিসিগথ সংস্কৃতির ওপরে। ভিসিগথরা জার্মানির থেকে এসেছিলো। ওদের জীবনযাত্রা অনেকটা বেদুইনদের মতো ছিল। ভিসিগথরা খুব সম্ভবতঃ ৫৪৬ সাল থেকে ৭২০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করে। এর পরে আসে আফ্রিকা থেকে ইসলামিক মুরেরা। মুর বলতে বোঝায় আফ্রিকার কালো মুসলমানদের। শেক্সপীয়ার-এর 'ওথেলো' তে ওথেলো ছিল মুর। উইট্টিজা নামে এক ভিসিগথ রাজার মৃত্যুর পরে রুডরিক বলে আর একজন টোলিডোর রাজা হন। কিন্তু রাজত্ব ভেঙে পড়ছিলো। ইতিমধ্যে 'মুসা ইবন নাসের' নামে একজন আরবি মুসলমান টোলিডোর কাছে কিছু জায়গার দখল নিয়ে নেন। 'তারিক বিন জিয়াদ' ছিলেন মুসার সেনাপতি। রুডরিকের মৃত্যুর পর ভিসিগথদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারিক সম্ভবতঃ ৭১১ বা ৭১২ সালে টোলিডো জয় করেন।
টোলিডোতে যুদ্ধে জেতার পরে মুসা এবং তারিক দামাস্কাসে (সিরিয়া) ফিরে যান। স্পেনের আরবিক মুসলমান রাজত্ব প্রথমে সেভিলে শুরু হলেও পরে তা কর্ডোবাতে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্ডোবাতে আল আন্দালুসের রাজ্যপাল ছিলেন তখন 'আবাদ আল মালিক ইবন কাতান' নামে এক মুসলমান। মুরদের এই ইতিহাস চলে ১০৮৫ সাল অবধি। অর্থাৎ প্রায় ৩৭৩ বছর ধরে। ১০৮৫ সালের ২৫ শে মে 'আলফনসো ৬' প্রথম খ্রীষ্টান হিসেবে টোলিডো জয় করেন। আলফনসো ৬ কিন্তু কোনো মুসলমান বা ইহুদিদের সংস্কৃতির ওপরে অত্যাচার করেননি। উল্টে তিনি অনেক মুসলিম এবং ইহুদি পণ্ডিতদের দিয়ে ওদের লাইব্রেরির বইগুলিকে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। এদিক সেদিক ঘুরিয়ে গাইড আমাদের বললো যে আমরা এখন ইহুদিদের (jew) কোয়ার্টারে এসে গেছি। একটা চড়া বিচ্ছিরি গন্ধ যেন আমার নাকে এসে লাগলো। এ গন্ধ আমার চেনা ! গন্ধটা যেন কয়েকশো বছরের পুরোনো। আমার ছোটবেলার কয়েকটা বছর কেটেছিল কলকাতার জোড়াবাগানে। একটা ছানাপট্টি ছিল আমাদের বাড়ির কাছেই। ওই ছানাপট্টির পাশ দিয়ে গেলেই একটা যেন পচা গন্ধ আমি পেতাম। আমার নাকে ওই ছানাপট্টির গন্ধটা যেন ধক করে এসে লাগলো। এ গন্ধ যেন হাজার বছর আগের পৃথিবীর গন্ধ। বারোশো এবং তেরোশো সালে স্পেনের অনেক ধনী ইহুদিরা এই অঞ্চলটাতে থাকতো। রাস্তার দুপাশে সুন্দর সুন্দর বুটিকের দোকান, সুন্দর সুন্দর রেস্টোরেন্ট, এবং আরো অনেক রকমের জমজমাট দোকানের সারি। এই অঞ্চলটাকে সম্মান দেবার এবং চিহ্নিত করার জন্য ইজরায়েলি সরকার রাস্তার ওপরে কিছু ফলক লাগিয়েছে। স্ত্রী এবং মেয়েরা কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলো। আমি বোঝাতে পারবোনা কিভাবে যেন একটা অন্য রকম সেন্সেশন শরীরে ফিল করছিলাম। কিছুক্ষণ একটা বেঞ্চে বসে একটু এগিয়ে গিয়েই দেখলাম একটা সিনাগগ।
সিনাগগটার নাম 'সান্তা মারিয়া লা ব্লাঙ্কা'। সিনাগগটি তৈরি করেছিল মূরেরা সম্ভবতঃ ১২০৫ সাল নাগাদ। সিনাগগটা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো সিনাগগ। সামনে একটা খোলা চত্বর এবং ভেতরে ইহুদিদের প্রার্থনার জায়গা। ভেতরে ঢুকলে মনে হবে না প্রায় আটশো দশ বছর আগে এটা তৈরি হয়েছিল। আলো ঝলমলে দালান, নতুন রং করা দেয়াল আর ঝাঁ-চকচকে মেঝে দেখে কেউ যদি আপনাকে বলে এই বাড়িটা ছমাস আগে তৈরি হয়েছে, আপনি কোনো আপত্তি করতে নাও পারেন। সিনাগগ থেকে বেরিয়ে কিছুটা সোজা গিয়ে ডানদিকে টার্ন করতেই একটা 'মনাস্টেরি' দেখতে পেলাম। নাম হচ্ছে 'Monastery of San Juan de Los Reyes'।
Cesar / CC BY-SA
মনাস্টেরিটা তৈরি করেছিলেন আরাগনের শাসক ফার্ডিনান্ড II এবং ক্যাস্টিলের রানি ইসাবেলা I ১৪৭৬ সালে ফার্ডিনান্ড II পর্তুগালের আলফনসো V-কে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এইসময় তাঁদের এক সন্তান জন্মায়। এই সুসময়ের স্মৃতিগুলি ধরে রাখবার জন্যে তাঁরা মনাস্টেরিটা বানান। নির্মাণকার্য শুরু হয় ১৪৭৭ সালে এবং শেষ হয় ১৫০৪ সালে। আমাদের সময় নেই ভেতরে ঢুকে এটা দেখবার। বাইরের দেওয়ালে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট ওপরে অনেকগুলো শেকল ঝুলছে। মনে হয় যেন একটা নারকীয় দৃশ্য! রানী ইসাবেলা ছিলেন একজন উদারস্বভাবের মহিলা। কলম্বাসের আমেরিকা আসার স্পনসর ছিলেন উনি। এইজন্যে ওনার নাম হয়েছিল 'ইসাবেলা দি ক্যাথলিক'। ক্যাথলিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেতার পর দেখেন মুসলমান রাজাদের অনেক ক্যাথলিক ক্রীতদাস ছিল। রানী ইসাবেলা সমস্ত ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেন এবং স্বাধীনতার স্মারক হিসেবে ওই চেনগুলোকে মনাস্টেরির দেয়ালে লাগিয়ে দেন। এই হিসেবে রানি ইসাবেলাকে অনেকে 'মুক্তিদাতা

ইসাবেলা' নামেও ডেকে থাকেন।
সবকিছু দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তার মোড়ের এপারে একটি ইহুদিপাড়া আর উল্টোদিকে খ্রিস্টানদের গির্জা এবং মুসলমানদের মসজিদ। প্রত্যেকটা ধর্মই যেন একই সঙ্গে চলমান ছিল। এরমধ্যে গাইড আমাদের একটা স্ট্যাচুর সামনে নিয়ে এল। স্ট্যাচুটা 'জুয়ান লোপেজ ডি পাডিলা' নামে টোলিডোর একজন বিশ্বস্ত নাগরিকের। জুয়ান লোপেজ ডি পাডিলা ১৪৯০ সালে টোলিডোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তৎকালীন টোলিডোর শত্রুদের (মূলতঃ রোমান) বিরুদ্ধে লড়াই করে যান। ১৫২১ সালের ২৩ এপ্রিল ' ভিয়ালার ডি লস কমুনেরস'-এ তাঁর সৈন্যবাহিনী চরমভাবে পরাজিত হয় এবং পরের দিন অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল জনসমক্ষে পাডিলার মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। এসব বলার পরেই গাইড বলল আমাদের বাসের কাছে ফিরে যেতে হবে আর আধঘন্টার মধ্যে। আমার বন্ধু চিরঞ্জীব বলেছিল টোলিডোতে নাকি খ্যাতনামা লেখক সারভান্তির লেখা উপন্যাসের চরিত্র ডন কিহোটে'র (Don Quixote) কার্যকলাপের অনেক নিদর্শন আছে। গাইডের সময়ের সতর্কবাণী শুনে বুঝলাম যে ওই সমস্ত নিদর্শন এযাত্রায় আর দেখা হবে না। ১০২ ডিগ্রী তাপমাত্রায় বেশ লম্বা একটা ব্রিজ পেরিয়ে আবার বাসে উঠে পড়লাম। প্রায় পনেরো মিনিট বাসে বসে থাকতে হল বাকী যাত্রীদের দেরি করে আসার জন্যে। কিন্তু ওই সময়টায় বাসের ঠান্ডা এয়ার কন্ডিশনারটা আমাকে অন্য জগতে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ঘুম ভেঙেছিল আড়াই ঘন্টা পরে মাদ্রিদে পৌঁছে। সে গল্প পরে হবে !!

Diliff / CC BY-SA

ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসের কাছে এক ছোট্ট শহরের বাসিন্দা সিদ্ধার্থ চৌধুরী। শিবপুর বি.ই. কলেজ থেকে পাস করে উচ্চশিক্ষার্থে মিচিগানে আসেন। পরে চাকরিসূত্রে বিদেশেই থিতু হন। বর্তমানে অবসর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদেশ-ওদেশ আর লিখে ফেলছেন সেইসব বৃত্তান্ত।

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

পানিবিটায় এক ঝড়ের রাত

মৈনাক সেনগুপ্ত

ওইরকম রাত আমি অনেক চেয়েছি আমার জীবনে। যখন বয়েসের বাধা না মেনে, চোখ খুলে, এমনকি রাস্তা হাঁটতেও দিবাস্বপ্ন দেখেছি নিজের নায়কোচিত পাগলামির। তখন অনেকবার ওইরকম একটা রাত চেয়েছি মনে মনে। যেরকমটা পেলাম সেবার কালিঝার ছাড়িয়ে পানিবিটায়।

ছজন আমরা, তিনদিন হেঁটে, তখন পশ্চিম সিকিমের সিঙ্গালিলা পাহাড়ের খাঁজে। গন্তব্য কালিঝার ক্যাম্পসাইট। সরু একচিলতে রাস্তায় বিকেলের আলো ফিকে হতে চাইছে খুব করে। চিপচিপি ছাড়িয়েছি বেশ খানিকক্ষণ। গাইড ভাই নিমাকে "কতক্ষণ" জানতে চেয়ে ফলাফল বিশেষ ভালো হয়নি বলে আর জিজ্ঞাসা করব না-ই ঠিক করেছি। সত্তর ডিগ্রি গ্র্যাডিয়েন্টে টানা ওঠার ধাক্কা এবার পিঠে বাইশ কেজির চাপে ধরা পড়ছে বেশ। সামনে নিমা এগিয়ে গেছে একটু বেশিই, একটা সাদা ঘোলাটে চাদর পাক খেয়ে তৈরি হচ্ছে। হঠাৎ একটা ধাক্কায় আটাত্তর কেজির আমি, বাইশের রুকস্যাক নিয়ে বাঁদিকের পাথুরে দেওয়ালে সজোরে গিয়ে পড়লাম। দম প্রায় বন্ধ, সাদা চাদরটা দুহাত সামনে। বুঝলাম, ঝড় উঠছে। অশনি সংকেত। পিছনের হতক্লান্ত মানুষগুলোকে নির্দয়ের মত এগোতে বলা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আমরা তখন ১১০০০ ফিট উচ্চতায়, ট্রি লাইন-এর ওপরেই হবে। একদিকে পাহাড়ি দেওয়াল আর অন্যদিকে নিচে তাকিয়ে বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছেনা। ওখানে ঝড়ে উড়ে গিয়ে পড়লে ঠিক কি হবে সেটা আমার অনভিজ্ঞ বন্ধুদের বলা যাবেনা। কাজেই যেভাবেই হোক, এগোতে হবে। আমার ভরসাতেই ওরা এসেছে সিকিমের এই উচ্চতায় ট্রেক করতে। আমি যে ভয় পাচ্ছি, অল্প হলেও পাচ্ছি, সেটা বুঝতে না দিয়ে এগিয়ে যাই। সামনে হঠাৎ কিছু ঠাহর করতে না পেরে গলা ছেড়ে নিমা বলে ডাকতে, শূন্য থেকে একফালি নীল বেড়িয়ে আসে। নিমার উইন্ডচিটার। কালিঝার ক্যাম্পসাইটে পৌঁছেছি তবে? ক্যাম্প-ই বটে। গোটা তাঁবুটা কারা যেন নাড়িয়ে নাড়িয়ে উপড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। আর আমরা পালা করে কেউ না কেউ তাঁবুর খুঁটিটা ধরে রাখার চেষ্টা করছি। নিমা ওর লোকজন নিয়ে তারই মধ্যে স্যুপ বানানোর কাজে। ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে চিৎকার করল, "দাজু, ইধার রহ্ নাহি পাওগে, রাত গুজরনা নামুমকিন কে বরাবর হ্যায়। নেপাল সাইড মে পানিবিটা পে এক গোট (ঘর) হ্যায়। কোই রেহতা নেহি। উধার যানা হি হোগা।"

- কিতনি দূর?

- আধা ঘন্টা অওর, উস পাহাড়ি কে পিছে।

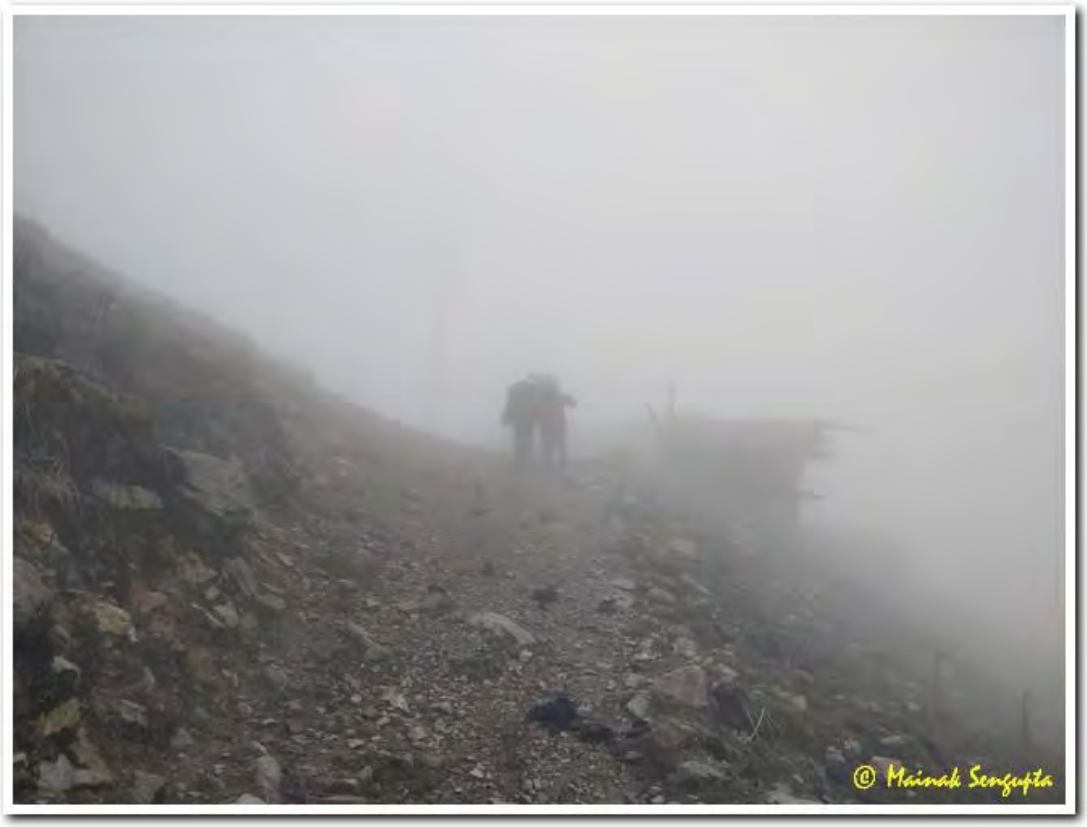

কাজে কাজেই তলপিতলপা গুটিয়ে ঝড়ের মধ্যে নেমে পড়া। "উস পাহাড়ি..."র আগুপিছু কিছুই বোঝা যাচ্ছেনা। তার মধ্যেই অনায়াস দক্ষতায় রাস্তা খুঁজে আমাদের দেখিয়ে দিতে দিতে যাচ্ছে নিমা। হাওয়ার পাগলামি বাড়ছে মনে হয়, আর পাল্লা দিয়ে রাস্তার সরু হওয়াও, হ্যাঁ বন্ধুরতা তো বটেই। শেষ সূর্যের আলো সাদা চাদরের ফাঁকে ফাঁকে অপটু হাতে রিফু করা হলদে সুতো তখন, কিন্তু এরপর সন্ধ্যে নামলে... ভাবনাটুকু আর শেষ করি না। রাস্তা থেকে চোখ তুলে নিলে পাথরে হোঁচট, চোখ নামালে পরের বাঁকটা না দেখতে পাওয়ার আশঙ্কা, কাজেই গতি শ্লথ। হালকা একটা গলার আওয়াজ যেন, ডানদিকে খাদের ধার হঠাৎ একটা বাদামি পাথরে শেষ হয়ে যাচ্ছে কি? কয়েক পা এগোলে ভুলটা বুঝলাম, বাদামি পাথরটা আসলে একটা কাঠের বাড়ির বহিরাঙ্গ - পানিবিটা! এই বাড়িতেই আজ আমাদের ঝড়ের রাতের অভিসার।

বাড়িটা আমরা ছোটবেলায় যেমন কুঁড়েঘর আঁকতাম অনেকটা তেমনি। শুধু মাথার ওপরের চালটায় বেশ অনেক ক'টা গর্ত আর দরজাটা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। কাজেই ঝড়ের সরাসরি প্রকোপ থেকে বাঁচলেও চাবুকের মত ঠাণ্ডা হাওয়া এদিক সেদিক থেকে এই লখিন্দরের কুঠিতে ঢুকে পড়ার আগাম ইশারা দিয়েই রাখছে। বাড়িটা বেশ কিছুদিন হল পরিত্যক্ত। দেওয়ালের কোটরে কিছু খালি শিশি, কয়েকটা পাত্র, ওই দিকের দেওয়ালটায় একটা অলস কুঠার হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। অনেকদিন কোথাও ঘা দেয়নি। আর এধারে ওধারে স্তূপীকৃত চমরী গাই-এর লোম। বোধহয় শীতের সম্বল। আর আমাদের তখনকার সম্বল মেঝেতে ঠিক মধ্যিখানটায় মাটি কেটে বানানো একটা আগুন তৈরির জায়গা। নিমারা দল বেঁধে নিমেষেই কাঠ নিয়ে হাজির। রাত নামছে বাইরে, ঝড় উত্তরোত্তর বাড়ছে, হুড়মুড় করে ঢুকতে চেয়ে দখল চাইছে ঘরটার। আগুনটা যে কতক্ষণ বীরের মতন যুঝবে তা সময়ই বলবে। নিমারা রান্নার আয়োজন করছে ওই আগুনেই। অদ্ভুত এই পাহাড়ি মানুষগুলো। ক্লান্তিহীন, বিরক্তিহীন আর সর্বদা হাসিমুখ নিয়ে আমাদের ভিত্তিহীন গর্বকে খর্ব করতে বেখেয়ালে ব্যস্ত।

খানিক গল্প, খানিক খেলা, খানিক্ষণ খাওয়াদাওয়া, আসলে সবই সময় কাটাবার অছিলা। রাতটা কাটিয়ে দেওয়ার সমবেত প্রচেষ্টা। কিন্তু সময় যে কখন থমকে দাঁড়াবে আবার কখন না চাইতেও শেষ হয়ে যাবে, তা কি আর সামান্য এই আমাদের ইচ্ছের মুখাপেক্ষী? তাই ঘুমোনোর চেষ্টা ব্যতীত আর কোনো উপায় থাকেনা। এদিকে কাঠের দেওয়ালে ধাক্কার তীব্রতা আর অস্থির হয়ে ওঠা ঝড়ের গর্জন আমাদের সব চেষ্টাকেই একটা অসম প্রতিযোগিতায় ফেলছে অবিরত। পাহাড়ে নতুন ছেলেমেয়েগুলো ভয় পেয়েছে হয়তো, কিন্তু যুঝেও চলেছে বেশ। একবারও বিরক্তি প্রকাশ করেনি। ঘেঁষাঘেষি বসে স্লিপিং ব্যাগ এর উষ্ণতাও তখন ফিকে। কাজে কাজেই সকলেই না-ঘুমে, সকলেই চুপ। সকলেই একলা। আগুনটা নিভু আঁচে জ্বলছে, আর হয়তো কয়েকটা মুহূর্ত। হঠাৎ একরাশ হিমশীতল হাওয়া মেজাজ হারিয়ে ঘরে ঢুকে মৃতপ্রায় আগুনটার মৃত্যুযন্ত্রণার মেয়াদ শেষের ঘোষণা করে আমাদের দিকে নজর ফেরায়। অন্ধকার ঠেলে একটা টর্চ জ্বালালাম, কাঁপা আলোয় টর্চ তার বিদ্রোহী মনোভাব ব্যক্ত করল। কিন্তু অবিলম্বে হাওয়ার অনধিকার প্রবেশ বন্ধ না করলে সকাল দেখতে পাবো কিনা কে জানে, এই ভয়কে কাজে লাগিয়েই স্লিপিং ব্যাগ ছেড়ে উঠে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার চাবুক পড়ে শপাং করে আর আমি হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে দেখি, গুটিয়ে রাখা তাঁবুর ব্যাগে পা জড়িয়ে গেছিল। তাঁবু? কে যেন ফিসফিসিয়ে ওঠে, তাঁবু টাঙ্গাও ... তাঁবু টাঙ্গাও। কে জানে কে? বোধহয় ওই থার্ড ম্যান ফ্যাক্টর। দ্য মিস্টেরিয়াস থার্ড ম্যান হু ভিজিটস এক্সপ্লোরারস ইন ডিস্ট্রেস। পারলৌকিক চর্চার সময় ছিলো না। তাঁবুর কাপড় দিয়ে ঘরের এধার থেকে ওধার বাঁধার চেষ্টায় যখন সফল হলাম, তখন শীত থামিয়ে ঘাম দিয়েছে। তাঁবুর তলায় ঠাণ্ডার প্রকোপ অনেকটাই কমেছে যেন। ইচ্ছে করলো একবার বাইরে যাওয়ার। একবার দাঁড়িয়ে দেখে আসার আশ - পাহাড়ি ঠাণ্ডায় ঘন অন্ধকারে ঝড় দেখতে কেমন? দরজার বন্ধ পাথরটা অল্প সরালাম, বাইরেটা কালো রঙের। নিঃশ্বাসের জন্য ধার করা হাওয়াটুকু বার বার চোখের সামনে থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছে। ঝড়ের শব্দ তখন ওঠানামার খেলায় ব্যস্ত। আমি জানি সামনে ফুট বিশেক দূরে খাদ। ওদিকে এগোবো না। আদৌ এগোবো কোথাও? কী প্রয়োজন এই পাগলামির? কিন্তু পাগলামির কি প্রয়োজনীয়তা লাগে? স্বেন হেদিন এর লাগেনি। তাকলামাকান পেরিয়ে মরতে মরতে বেঁচে খুঁজে পেয়েছিল হারিয়ে যাওয়া শহর লুওলান। বদ্ধ পাগল। অরেল স্টেইন-ই বা কম কি? এগোই তাহলে।

এসব ভাবতে ভাবতে যখন চোখ খুললাম, তখন একটা পেন্সিলের মত হলদে আলো স্লিপিং ব্যাগ এর পায়ের কাছে এসে পড়ছে। আমার ডান দিকে ওরা ঘুমিয়ে, নিশ্চিন্তেই মনে হল। মাথার ওপর তাঁবুর কাপড়ের আশ্রয়। উঠে বসলাম। আলোটা যেন বাড়লো খানিক। নিমারাও ঘুমে। বাইরের জান্তব শব্দটা আর নেই। ঝড় থেমেছে। আমি তাহলে ঘুমাচ্ছিলাম? তাইই নিশ্চয়। চোখ কচলে বিমূঢ়তা কাটাই। দরজাটা দেখা যাচ্ছে... পাথরটা অল্প করে সরানো যেন!

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা আর সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি বেড়ানোটাকেও জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছেন মৈনাক সেনগুপ্ত। তিনি মনে করেন বেড়ানো মানে কোথাও শুধু পৌঁছানোই নয়, তার সঙ্গে জায়গাগুলির সম্বন্ধে জানা এবং মানুষজনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাও।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন : 4
গড় : 4.75
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

শেষ বিকেলে হেনরি'জ আইল্যান্ডে

অরিন্দম পাত্র

মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠলাম! হঠাৎ কানের পাশে সুতীব্র বাঁশির আওয়াজ আর সাথে লাঠিধারী গার্ডের চিৎকার - "বিচ খালি করে দিন ...সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে!"
খেয়াল হল তখন, আরে ঢোকার সময় দেখেছিলাম বাইরে বোর্ডে লেখা সময়সূচী - ভোর ছটা থেকে বিকাল পাঁচটা। লোকটা তাও আধ ঘন্টা গ্রেস দিয়েছে! খুব ভালো লোক বলতে হবে! এবারে তবে চলে যাবার পালা.... হেনরি'জ আইল্যান্ডের ওই দেড় ঘন্টা সময় কাটানোর পাওনার ঝুলি এতটাই বেশি যে দুঃখ হলেও সেই দুঃখ ভোলার জন্য মনের ক্যামেরায় আর বাস্তবের ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলোই যথেষ্ট ছিল! পিছিয়ে যাই দেড় ঘন্টা আগের সময়ে...রিওয়াইন্ড করি একটু।আজ

দুপুরেই বকখালি এসেছি। উঠেছি বে ভিউ ট্যুরিস্ট লজে। লাঞ্চে ভরপেট খেয়ে একটু গড়িয়ে নিয়েই বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়া। গন্তব্য হেনরি'জ আইল্যান্ড। বছর ছয়েক আগে একবার বকখালি আসা হয়েছিল...তারপর এই আবার আসা!

মূল রাস্তা থেকে ডান দিকে ঘুরে সরু রাস্তা ধরে মিনিট দশেকেই চলে আসা গেল হেনরি'জ আইল্যান্ডে! টিকিট কেটে আর গাড়ির পার্কিং ফি মিটিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। পাশেই বোর্ডে সময়সূচী লেখা। এখন বাজে বিকেল চারটে। হাতে তার মানে ঘন্টাখানেক আছে। ওদিকে আকাশের একটা কোণা কালো হয়ে আসছে, বৃষ্টি এল বলে। ছাতাটা হাতে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম সেই সবুজ সুড়ঙ্গপথ ধরে হেনরি'জ আইল্যান্ড সি বিচের দিকে!

সুবিশাল সৈকত আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকজন ট্যুরিস্ট! সব মিলিয়ে জনা পঁচিশ-তিরিশজন হবেন হয়ত। আকাশের এদিকটায় কিন্তু মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। নির্মেঘ আকাশে আক্ষরিক অর্থেই সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘেরা ভেসে বেড়াচ্ছে যেন শরত এসে গেছে! মন খুশি করে দেওয়ার মত আবহ। বাচ্চাদের আনন্দ আর ধরে না, জলের দিকে ছুটে গিয়ে, জল ছুঁড়ে, জলে পা ডুবিয়ে যে যার মত পারছে আনন্দ করছে।

সৈকতের এক জায়গায় দেখি একটা ট্রাইপড বসানো। একজন ভদ্রলোক ক্যামেরা নিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে ল্যান্ডস্কেপ ছবি তোলার তোড়জোড় করছেন। ল্যান্ডস্কেপ ছবি তুলতে যারা ভালবাসেন, তাদের জন্য সত্যিই আদর্শ আবহাওয়া ছিল সেদিন! ঘন নীল আকাশের সাদা মেঘে অস্তগামী সূর্যের সোনা রঙ পড়ে সে এক আশ্চর্য মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে চারিদিকে। আমি কখনো আন্দামান যাইনি, ছবিতে আন্দামান ভ্রমণ করেছি। তবে সেদিনের বিকেলের হেনরি'জ আইল্যান্ডের সৌন্দর্য আন্দামানের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না বলে আমি মনে করি!

নিজেকে হারিয়ে প্রায় ফেলেছি যখন ঠিক সেই সময় রসভঙ্গ হল রক্ষী'র বাঁশির আওয়াজে! সব ভালো কিছুরই একটা শেষ আছে, এই ভেবে পায়ে পায়ে ফিরে চললাম সঙ্গে ক্যামেরাবন্দী করে সেই সোনালী বিকেলের স্মৃতি!! কিন্তু বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল যে!! সেই সবুজ সুড়ঙ্গপথ বেয়ে ফিরে আসতে আসতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি আকাশে রামধনু উঠেছে। আমাদের দর্শনসুখের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিল সেই সাতরঙা রামধনু। তখনো জানতাম না পরের দিন বিকেলে বকখালি সি বিচে আবার একবার দেখতে পাব আরও বড় আর আকাশজোড়া রামধনু, যার গল্প আপনাদের পরে নাহয় একদিন বলব!

পেশায় চিকিৎসক (নাক কান ও গলা বিশেষজ্ঞ) অরিন্দম পাত্রের নেশা ছবি তোলা। এছাড়াও দেশের মধ্যে নানা জায়গায় ভ্রমণ করা তাঁর আর এক শখ।।

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন : 4
গড় : 4.75

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

দুর্দান্ত লেখনী

- রাম মিত্র [2020-07-28]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu